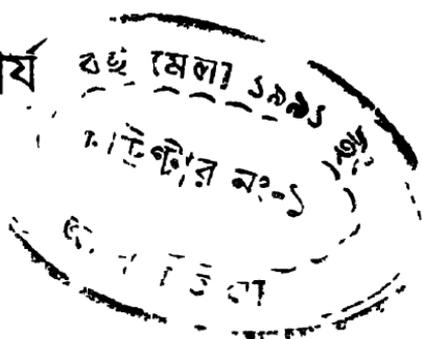


হা রে কলকাতা

হা রে কলকাতা

ফণিভূষণ আচার্য



বিকাশ গ্রন্থ-ভবন

৩৭/৩, বেনিয়াটোলা লেন,

কলিকাতা-৭০০ ০০৯

নীলু তার বিছানাটা পেতে নেবে ভাবছিল, এমন সময় সাতাশ নম্বর সিটের মালিক এলেন। তার এ ব্যাপারে অ-খুশী হবার প্রস্তুতি ওঠে না, তবু সে কেমন-যেন খুশী হতে পারলোনা। একপাশে তার রঙচুটা টিনের স্ট্রাকেশ, অন্যপাশে সতরঞ্চি-জড়ানো নারকেল-দড়ি-দিয়ে-বাঁধা বিছানাটার মাঝখানে ছদ্মকি ছোটো হাত যথাসম্ভব ছড়িয়ে দিয়ে সে সোজা হয়ে বসলো।

ভদ্রলোকের হাতে ছোট্ট একটি জলের কুঁজো, পেছনে ব্যাগ-হাতে একটি মেয়ে। মেয়েটির পেছনে একটি দশসই কুলি। মেয়েটিকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে নীলু ভুরু কঁচকালো। কোথায় যেন সে দেখেছে একে। না, মনে পড়ছেনা তার। রাস্তায় দাঁড়ালে অনেক মেয়েই হো চোখে পড়ে। তাদের সবাইকে কি মনে রাখা সম্ভব?

এদিকে ভদ্রলোক এতক্ষণে নীচু হয়ে সিটের নিচে হাতের কুঁজোটাকে সাবধানে রাখলেন। তারপর কুলির মাথা থেকে দামী লেদার স্ট্রাকেশ ও হোল্ডঅলটা সিটের ওপর নামিয়ে রেখে নিজের দীর্ঘতায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গিলেকরা পাঞ্জাবীর হাতার ভেতর থেকে তাঁর ঘর্মান্ত ফর্সা হাতছোটো বের করতে করতে আড়চোখে নীলুর মুখের দিকে তাকালেন।

: ছাব্বিশ নম্বর কার, আপনার ?

নীলু শুধু মাথা নাড়লো। সে মেয়েটাকে কোথায় দেখেছে, মনে করবার চেষ্টা করছিল তখন। সেইজগে উত্তরটা তাকে খুব সংক্ষেপে সারতে হলো। হয়তো সেইজগেই ভদ্রলোক মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে একটু ব্যস্তভাবে মেয়েটিকে বললেন : গাড়ি ছাড়তে বেশি দেরি নেই। আয়, বিছানাটা পেতে ফেলি।

: এখনই ?

সুরেলা গলায় মেয়েটি ছোট্ট আপত্তি তুলেছিল। ভদ্রলোক তার কথায় কান না দিয়ে হোল্ডঅলের বেন্ট খুলে ফেললেন। মেয়েটি হাতের ব্যাগটা কোথায় রাখবে ভেবে না পেয়ে নীলুর সিটের ওপর রেখে ভদ্রলোকের সঙ্গে হাত লাগালো। নিচু হতেই পিঠের বেগী সরে গিয়ে তার ফর্সা নিটোল ঘাড়ের সবটাই নীলুর চোখে পড়ে গেল। আহ, এই তো সুযোগ! এইটুকু সময়ের মধ্যে যতখানি পারা যায় মেয়েটাকে দেখে ফেলতে হবে। ঘুরে দাঁড়ালে মেয়েটাই তখন বাধা হয়ে উঠবে তাকে দেখার। সঙ্গে আবার ভদ্রলোকটি রয়েছে। সুবিধে হবে না।

কিন্তু মেয়েটাকে তার বেশ চেনা-চেনা লাগছে। কোথায় সে দেখেছে যেন ওকে, কিছুতেই মনে করে উঠতে পারছে না তো!

বিছানা পাতা হয়ে গেল। মেয়েটি তার ব্যাগটা তুলে নিয়ে একটা রুমাল বের করে কপাল, নাক এবং তার নিটোল হাত দুটো মুছে নিয়ে সিটের ওপর বসে পড়লো। ভদ্রলোকও তার পাশে বসে সিগারেট ধরালেন, গাল ভরে ধোঁয়া ছড়ালেন। কি ভেবে মেয়েটির কানের কাছে মুখ এনে কি বললেন, নীলু শুনতে পেল না।

ওদিকে একটা বাচ্চা খুব কাঁদছিল। তারই মাঝখানে ভদ্রলোক ও মেয়েটি ছুজনেই হো হো করে হেসে উঠলেন। নীলু ছদিকে তার টিনের স্মটকেশ আব বিছানার ওপর হাতদুটো রেখে সোজা হয়ে বসলো। হঠাৎ তার দিকে তাকিয়ে মুখের হাসি মুছে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন : আপনি কোথায় যাচ্ছেন, ভাই ?

: দিল্লী—

নীলু একটু জোর দিয়েই বললো। বই আর খবরের কাগজে পড়া দিল্লী সে এর আগে কখনো যায়নি। এই তার প্রথম যাওয়া, হয়তো এই শেষ। কাজেই, বলার সুযোগ সে যখন একবার

পেয়েছে, তখন সে ইচ্ছে করেই গলাটাকে একটু উচ্চশ্রোমে তুলে দিল। তোমরাই দিল্লী যেতে পারো, আমরা পারিনা? ইয়াকি!

ভঙ্গলোক গম্ভীরভাবে মেয়েটিকে কি বললো। মেয়েটি ব্যাগ খুলে সাবধানে কি সব দেখে নিল একবার।

আর বেশিক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে থাকা ঠিক নয় ভেবে নীলু বাইরের দিকে চোখ ফেরালো। লোকজন, কুলি আর ফেরিওয়াদের ব্যস্ততা তখন বেড়ে উঠেছে। কম্পার্টমেন্টটা এতক্ষণ একটু হালকা হতে শুরু করেছে। ট্রেনে যত লোক যায়, তার চেয়ে বেশি লোক আসে সি-অফ্ করতে। এইটেই ফ্যাশান। ঢোকান সময় দরজার কাছে তাই রীতিমতো একটা জ্যাম হয়ে গিয়েছিল। নীলু কিন্তু একাই এসেছে। তাকে সি-অফ্ করতে কেউ আসেনি। কে-ই বা আসবে তাকে সি-অফ্ করতে?

ভঙ্গলোক ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

: ঠিকমতো বসিস্—

উনি নেমে গিয়ে আবার জানলার কাছে তাঁর ফর্সা মুখ নিয়ে ভেসে উঠলেন। ততক্ষণে গার্ডের বাঁশি এবং রেলের বিদ্যুৎ-সংকেত পর পর শোনা হয়ে গেছে। ভঙ্গলোক জানলার কাছে মুখ এনে জ্বোরে জ্বোরে বললেন : সাবধানে যাস্। পৌঁছেই একটা চিঠি দিবি। নইলে তোর মাকে তো জানিস্—

গাড়ির চাকা ঘুরলো। ভঙ্গলোকের ফর্সা লম্বা মস্তকানা ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছিল। মেয়েটি ক্রমাল নাড়া বন্ধ করে চোখের কোণদুটো মুছে নিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে একা একা বসে রইলো।

নীলু স্ট্রটকেশটা সিটের নিচে নামিয়ে রেখে আর দেরি না করে তার বিছানাটা খুলে ফেললো! 'সামান্য বিছানা, তাতে প্রচুর দৈন্ত—পাত্তে নীলুর সংকোচ হচ্ছিল। তবু সে তার ওপর

খুব সাহস করে বিছানার চাদরখানা পেতে নিল। সিটের তক্তাও বসতে বসতে সে জিজ্ঞেস করলো : আপনিও কি দিল্লী—?

: হ্যাঁ—

সংক্ষিপ্ত উত্তরটুকু দিতে কালো টানা-টানা চোখছটো ঈষৎ নেচে উঠলো তাব। এতক্ষণে সে তার চোখছটো ভাল করে দেখলো। সুন্দর— যেন তুলিতে আঁকা। সে কি কাজল পরার জগ্গে, নাকি চোখছটো তার এমনই সুন্দর? নীলু সোজা হয়ে বসলো।

: উনি গেলেন না?

: উনি আমাকে তুলে দিতে এসেছিলেন।

: অ—

নীলু বুকের ভেতর একটা প্রশ্ন এতক্ষণ জোব কবে চেপে রেখেছিল। এবার সে সুযোগ পেয়ে তাকে মুক্তি দিল।

: আচ্ছা, কিছু মনে কববেন না। আপনি কি শান্তিঘোষ স্ট্রীটে থাকেন?

: কেন বলুন তো?

: আপনাকে ওইদিকে দেখেছি, মনে হচ্ছে।

মেয়েটি কি যেন ভাবলো। আবার চোখছটো তাব একটু নেচে উঠলো।

: আপনি কি শান্তিঘোষ স্ট্রীটে থাকেন?

পাল্টা প্রশ্নে নীলু একটু বিব্রত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বেশ সপ্রতিভভাবে জবাব দেয় : না -মানে, শান্তিঘোষ স্ট্রীটের মোড়ে মাঝে মাঝে যাই।

: যান বৃষ্টি? কেন—?

: এই, আড্ডা আর কি!

মেয়েটি হাসলো। বললো : ওখানে আমার বন্ধুর বাড়ি। তাছাড়া, আগে আমরা শান্তিঘোষ স্ট্রীটেই থাকতাম। চার বছর হলো আমরা বালিগঞ্জ উঠে গেছি।

: অ—

মনে মনে নীলু নিজের সাহসকে তারিফ করে। সে কোনদিন কোন মেয়ের সঙ্গে আলাপ করা দূরের কথা, কথা বলতেই পারে না। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই তার হাতের তালুহুটো ঘেমে ওঠে। বাড়িতে মাঝে-মাঝে মীনার ছ'একজন বন্ধু আসে। দায়ে পড়ে কখনো-সখনো কথা বলতে হয় তাকে। তাতেই তার কেমন-যেন বৃকের ভেতরটায় জ্বালা করে ওঠে। মাঝে-মাঝে সে ভেবেছে, ওটা বৃষি তার কোন গোপন অস্থখ, নইলে কোন মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে তার বৃকের ভেতরটা এভাবে জ্বালা করবে কেন ?

সে প্রায় দশ-এগারো বছর আগেকার কথা। নীলুর বয়েস তখন তেরো কি চোদ্দ। বাড়িওলা হরশংকরবাবুর মেয়েরা তাকে আর মীনাকে নিয়ে বাড়ির মধ্যে লুকোচুরি খেলছিল। সন্ধে হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তখনো কোন ঘরে আলো জ্বলেনি। হরশংকরবাবুর বড় মেয়ে তন্দ্রা তখন সবে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। তাকে কোথাও না পেয়ে চিলে-কোঠায় খুঁজতে গিয়েছিল নীলু। আসলে লুকোবার এমন নিরাপদ জায়গা আর হয় না। 'তন্দ্রাদি!'— বলে নীলু ওকে ছোঁবার সঙ্গে সঙ্গেই তন্দ্রা ছুহাতে জড়িয়ে ধরেছিল তাকে। তার বালক বৃকের ওপর নরম কি ঠেকতেই নীলু ভয় পেয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল। সেদিন এবং তারপর কোনদিনই আর নীলু লুকোচুরি খেলেনি। পরের দিন তন্দ্রার বোনেরা ডাকতে এসে ফিরে গেলে তন্দ্রা নিজে এসেছিল ডাকতে : খেলবে না ?

নীলু তার মুখের দিকে তাকাতো পারেনি। গেষঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে মাথা নেড়েছিল শুধু।

: কেন ? কি হয়েছে ?

: না, খেলবোনা তোমার সঙ্গে।

: ছুয়ো, ছুয়ো—

বলতে বলতে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল তন্দ্রাদি। সেই থেকে নীলু ওদের খেলায় বাদ পড়ে গিয়েছিল। বছর চারেক আগে

সেই তন্ত্রাদির বিয়ে হয়ে গেছে। দিব্যি স্মৃতি ধরকরা করেছে সে।
মাঝে-মাঝে বাপের বাড়ি বেড়াতে আসে। তাকে দেখলেই নীলু
পাশ কাটিয়ে চলে যায়। তন্ত্রা তাকে একা পেলে খ্যাপায় : নীলু,
খেলেবে না ?

আর ঠিক তখনই নীলুর বুকের ভিতরটা জ্বলতে থাকে।—ঠিক
কেরোসিন পলতের নীলশিখার মতো। গলার ছুদিক ভীষণ
আঠালো ঠেকে, হাতের তালুছুটো জ্বব জ্বব করে ঘেমে ওঠে। অথচ
সে কাউকেই একথা বলতে পারেনা।

যে-কোন মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই তার ওরকম হয়।
নীলু অবাক হলো, আজ সেই পুরনো উপসর্গগুলোর কোনটাই দেখা
গেল না। টোক গিললো; গলা পরিষ্কার। হাতের তালুছুটো
সুকনো, খটখটে। মনে মনে খুশীই হলো সে।

মেয়েটির নাম শবরী। যিনি তাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে গেলেন,
উনি তার কাকা—চয়নকাকু। খুব ছেলেবেলায় বাবাকে হারিয়ে
শবরী আর কবরী ছুবোনে এই চয়নকাকুর কাছে মানুষ। বোদি
আর ছুই ভাইবিকে নিয়ে তাঁর সংসার। সেজগ্রে আর বিয়ে-থা
করা হয়ে ওঠেনি ভজ্রলোকের। এখনো তিনি ব্যাচেলার।

শবরী দিল্লী যাচ্ছে মামার কাছে বেড়াতে। অবিনমামা দিল্লীর
সরকারী অফিসার,—কোয়ার্টারে থাকেন। নতুন মামী এসেছে।
অনেকদিন ধরে অবিনমামা চিঠি লিখেছেন শবরীদের দিল্লী যাবার
জগ্রে।

: তাই বলে এই অসময়ে ? শুনেছি, এই জুন মাসে দিল্লী
নাকি জ্বলছে।

: কি করবো ? শবরী বলে : আমাদের পরীক্ষা তো সবে গত
সপ্তাহে শেষ হলো।

শবরীর বি. এ.পরীক্ষা গত সপ্তাহে শেষ হয়েছে।

একটু থেমে শবরী বলে : কবরীর খুব ইচ্ছে ছিল, আমার সঙ্গে আসে। কিন্তু ওর আর্ট কলেজে—সামনে আউট ডোর টেস্ট। রাগে স্টেশনে আমাকে 'সি-অফ্' করতেও এলোনা। চয়নকাকু কতো বোঝালো—

খুব সহজভাবে কথাগুলো বলে গেল শবরী।

: আর কি জানেন? আমরা দুজনে চলে এলে মা আর চয়নকাকু দুজনে ভীষণ লোনলি ফীল্ করতে। দুজনের একজনকে সব সময় ঠুঁদের কাছে চাই।

: তাই নাকি?

নীলু শবরীর কথায় বেশ উৎসাহ দেখায়। ট্রেনের চাকা খুব দ্রুত ঘুরছে। তারা কলকাতা থেকে প্রতি সেকেন্ডে যে দূর থেকে আরো দূরে চলে যাচ্ছে, শবরীর কথা শুনতে শুনতে তা তার মনেই হচ্ছে না।

: যেমন ধরুন, কবরীর আর্ট কলেজে ক্লাস দশটায়। কাজেই, আমাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মর্নিং কলেজে পড়তে হলো। দশটার মধ্যেই বাড়ি ফিরে আসা চাই।

তার কথার রেশ টেনে নীলু বলে চলে : এবং শ্রীমতী শবরী গাঙ্গুলি একেবারে লক্ষ্মী মেয়েটির মতো দশটা বাজার আগেই স্নুড়স্নুড় করে বাড়ি ফিরে আসেন!

: না স্মার, বিয়ে না হওয়া মেয়েদের শ্রীমতী বলে না।

শবরী মাথা ঝাঁকিয়ে বলে ওঠে।

: স্মরি, ব্যাচেলার মেয়েদের—

শবরী এবার থিল্ থিল্ করে হেসে ওঠে। হাসলে শবরীকে খুব ছেলেমানুষ মনে হয়।

: আঙ্কে না, মেয়েদের ব্যাচেলার বলে না! বলে—

: আচ্ছা মাস্টারের পাল্লায় পড়া গেছে!

: এখানেও ভুল। মাস্টার নয়—

নীলু ব্যাপারটাকে আরো হালকা করে দেয় : বোঝা যাচ্ছে,
সবে পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়েছেন।

এবার শবরী ভুরু কঁচকালো।

: কি ভাবছেন ?

শবরী চোখ নাচালো।

: ভাবছি, আপনি সত্যি সত্যি ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছেন তো ?
নাকি কলকাতায় পুলিশের খেদান খেয়ে—

: তার মানে খুনের আসামী ?

শবরী মাথা ঝাঁকিয়ে বলে : আজকাল সব সময় গুটার দরকার
হয়না। পুলিশের তাড়ায় কলকাতার বহু ইয়ংম্যান আজ কলকাতা-
ছাড়া—

: জানি। কিন্তু আমার সুটকেশে রেগুলার একখানা
ইন্টারভিউ লেটার আছে—

বাইরে অন্ধকার। সুদীর্ঘ ছুখানা বেলের ওপর দিয়ে
অন্ধকার ফুঁড়ে ট্রেনের চাকা উড়ে চলেছে যেন। রাতও
এগিয়ে চলেছে ট্রেনের স্পীডের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। শবরী
বলে : রাতের খাবার কিছু আছে তো ? আমি কিন্তু এবার
খাচ্ছি।

: খেয়ে নিন। আমি একটু পরে খাবো। আমাব আবার
একটু রাত করে খাওয়া অভ্যেস—

: উঁহু, এটি হবে না। একসঙ্গে ভাগ করে খাওয়া হবে। কই,
কি খাবার এনেছেন, বের করুন তো।

নীলু এই ভয়ই করছিল। আসার সময় মা কয়েকখানা রুটি
আর একটু শুকনো তরকারি একটা প্লাস্টিকের প্যাকেটে মুড়ে
দিয়েছিল। তার বেশি মা পাবেই বা কোথা থেকে ? নীলু ভেবেছিল,
শবরী ঘুমিয়ে পড়লে সে রুটি-তরকারি খেয়ে শবরীর কুঁজো থেকে
এক গেলাস জল গড়িয়ে খেয়ে নেবে। তারপর কোন স্টপেজে গাড়ি
থামলে এক কাপ গরম চা। বাস, শবরী জানতেও পারতো না, সে

রাস্তিতে কি খেয়েছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এত মেলামেশা না করলেই বুঝি ভালো হতো।

: কি হলো নীলিমবাবুর ডিনারের—

নীলু কৃত্রিম অনিচ্ছার সঙ্গে বলে : ভেবেছিলুম, মায়ে-দেওয়া খাবারের ভাগ কাউকে দেবো না। কিন্তু আপনি যেভাবে—

সুটকেশ খুলে প্লাস্টিকের প্যাকেটটা শবরীর হাতে দিয়ে মুখটা বিকৃত করে চেয়ে রইলো। কিন্তু নীলু যা ভেবেছিল, শবরীর মুখে তেমন কিছুই দেখা গেল না। বরং সে খুশী হয়ে বললো : হাতে-গড়া রুটি আমার যে কী ভালো লাগে। কিন্তু জানেন, মা খেতে দেয় না।

শবরী তার টিফিন কেরিয়ারটা নীলুর হাতে দিয়ে বলে : নিন, খুলুন তো।

নীলু ঢাকনাটা খুলেই চমকে উঠলো।

: ওরে ক্বাস! লুচি আলুর দম! দোতলার খবর তো এই, একতলায় খবরটা দেখি—

সেটা আরো চমকপ্রদ। তালশাঁস সন্দেশ—প্রায় গোটা কুড়ি!

: এ যে দেখি, কম্পার্টমেন্টসুদ্ধ লোকের খাবার নিয়ে এসেছেন। গান্ধুরামের পুরো দোকানটা তুলে নিয়ে এলেই তো পারতেন।

: ট্রেন কখন পৌঁছাবে খেয়াল আছে?

: তা ঠিক।

: তবে?

সারারাত নীলুর চোখে ঘুম এলোনা। শবরী কথা বলছিল। কথা বলার ফাঁকে কখন পরম নিশ্চিত্তে ঘুমিয়ে পড়েছে। আর সে একটা প্রভুভক্ত কুকুরের মতো জেগে থেকে যেন শবরীর শরীরটাকে পাহারা দিচ্ছে। ওদের মাথার কাছে একটা অবাঙালী লোক আণ্ডার-

প্যান্ট ছাড়া মিলের পাতলা ধূতি নেটের স্কাণ্ডো গেঞ্জি এবং গলায় সরু সোনার চেইন পরে বিপুল শরীর নিয়ে বারবার বাস থেকে ওঠানামা করছে। কাঁধে কিটস ব্যাগ। বোধ হয় হার্ড কাশ রয়েছে তাতে। এই লোকটার জন্মেই কি নীলু ঘুমোতে পারছে না সারা রাত? নাকি অশু কিছু?

গভীর রাতে নিজের বৃকের ভেতরের দিকে সে চেয়ে দেখলো। ওখানে একটা ময়লা কোঁটো রাখা আছে—তার একান্ত নিজস্ব। তার জংধরা ঢাকনাটা খুলে গেলে নীলু এক অশু জগতে চলে যায়।

বাবার খুব আদরের ছিল নীলু। দেখতেও নাকি ছিল সুন্দর। এই সেদিন পর্যন্ত সে বাবার কাছে ঘুমিয়েছে। বাবার রোজগার খুব একটা বেশি ছিলনা। সরকারী অফিসার। বাবা ছুঃখু করে বলতো, নামেই অফিসার। ভালপুকুরে ঘটি ডোবে না। খুব কষ্ট করে একটু বেশি ব্যয়েসে প্রোমোশন পেয়েছিলো বাবা। তাই সক্ষম কিছু করে উঠতে পারেনি। বাবার কল্পনা ছিল, নীলু পাস করে চাকরিতে ঢুকবে। মীনা রেডিয়োতে গান গাইবে। মিলু ডাক্তার হবে। কিন্তু নীলু গ্রোজুয়েট হবার অনেক আগেই বাবা হঠাৎ মারা গেল। বাবা যে এত ভাড়াভাড়ি মারা যাবে, নীলু ভাবতে পাবেনি। নীলুর সামনে সমস্ত পৃথিবীর আধখানা যেন ধসে পড়লো। বাবা ওদের সামনে সমস্ত কিছু আড়াল করে রাখতো। আসলে বাবাই ছিল সব। বাবা চলে গেলে সব শূন্য হয়ে গেল। তখনো বাবার শার্টে বাবার গায়ের গন্ধ লেগে আছে। ওটাই গায়ে দিয়ে তাকে বাবার সারাজীবনের পরিশ্রমের কাণাকড়ি কুড়োতে বেরুতে হলো। তার চোখের সামনে বাবার শরীরটা আগুনের ভেতর আস্তে আস্তে হারিয়ে গিয়েছিল। নীলু সেদিন কাঁদতে পারেনি। কাঁদবার মতো তার কোন অনুভূতিই ছিলনা সেদিন। কিন্তু পরে যখন সেই শরীরটারই খাটুনির সামান্য জমানো টাকা [সে মাসের মাইনের টাকাটাও] নিয়ে এসে সাদা ধান-পরা মার সাদা হাতখানাতে তুলে দিয়ে সে হু হু করে কেঁদে ফেলেছিল।

সেদিনই সে জানতে পেরেছিল, তার বাবা আর ফিরবে না।

বাবার ইচ্ছেমতো সে পরীক্ষা দিতে গেল। গায়ে দিয়ে যাবার মতো জামা ছিল না। বন্ধু পীযুষের কাছ থেকে একটা বাড়তি জামা চেয়ে এনে তাই গায়ে দিয়ে পরীক্ষা দিতে গেল সে। পীযুষ পরীক্ষার হলে তার জামার দাম উন্মূল করে নিয়েছিল। রেজাল্ট যখন বেরলো, দেখা গেল, নীলু পীযুষের চেয়ে অনেক কম নম্বর পেয়ে ফেল করতে করতে টায়েটুয়ে কোনমতে পাস করেছে। অথচ পীযুষ কোনদিনই ভালো ছেলে ছিলনা। সে বেশ ভালো রেজাল্ট করেই বেরিয়ে গেল। তার বাবার চেষ্ঠায় একটা চাকরিও যোগাড় হয়ে গেছে পীযুষের। কিন্তু নীলুব কিছুই হলোনা। অনেক ঘোরাঘুরি করেছে সে, অনেকের কাছে গেছে। বাবার বন্ধুবান্ধব, চেনাশোনা সবার কাছে। কিছুই হলোনা। মীনার পড়াগুলো বন্ধ। সে বাড়িতে গান শেখে। একজন গানের মাস্টার সামান্য মাইনেয় তাকে গান শিখিয়ে যায়। তাও কোন মাসে মাইনে দেওয়া হয়, কোন মাসে হয় না। মিলু ডাক্তারী পড়ছে। ভালো ছেলে সে। রেজাল্টও করেছে ভালো। স্কলারশিপ পায়। তার স্কলারশিপের খবর যেদিন এলো, সেদিন পাড়াব নন্দদা এসে মাকে বলে গিয়েছিলেন : ওকে ডাক্তারী পড়ান, কাকীমা। ও খুব ভাল 'শাইন' করবে। দেখবেন।

মিলু ডাক্তারী পড়ছে। স্কলারশিপ পায়। কিন্তু তাতে ওর হয় না। মাঝেমাঝে মার গয়নাগুলোতে হাত পড়ে। মার গয়নাও সব শেষ।

এমন সময় দিল্লী থেকে নীলুব একটা ইন্টারভিউর চিঠি এলো। অনেক জায়গায় অনেক ঘোরাঘুরি করেও যখন তার কিছুই হলোনা, তখন খবরের কাগজ দেখে একটা দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়েছিল সে। কয়েক মাস কেটে গেছে তারপর। ইতিমধ্যে সে আরো অনেক দরখাস্ত লিখেছে, পাঠিয়েছেও এখানে-ওখানে। সত্যি কথা বলতে কি, সে দিল্লীর দরখাস্তটার কথা ভুলেই গিয়েছিল। শেষে দিল্লী থেকে চিঠি এলো। ওটা ইন্টারভিউর চিঠি, চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্টের

চিঠি নয়। তবু চিঠিখানা দেখে মা আর মীনা হই-ঠে করেছিল খুব। কিন্তু নীলুর মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। সে বলেছিল : গিয়ে কি হবে, মা ? হবেনা, জানা কথা।

মা তাকে অনেক বুঝিয়েছে। বলেছে : না গেলে কি করে হবে রে ? চাকরি কি কেউ বাড়ি বয়ে এসে দিয়ে যায় ?

নীলু তখন বলেছিল : তুমি জানোনা মা, দিল্লী যাওয়া-আসার খরচ মেলা। আবার টি. এ.-ফিয়ে কিছুই দেবে না।

মা তারপব বাবার জামার বোতাম ছড়াটা ঠাকুর রামকৃষ্ণের ছবিত্তে ছুঁইয়ে তাব হাতে তুলে দিয়েছিল।

: ঠাকুরের দয়ায় যদি তোর চাকবিটা হয়—

নীলুর চোখেব কোণ ভিজ্জে উঠেছিল।

: কিন্তু মা, বাবার কোন স্মৃতিই যে আব রইলো না।

সেই বোতাম বিক্রির অর্ধেক টাকা সে মিলুকে দিয়েছে কতক-গুলো হাড়-কংকাল কেনার জন্তে। বাকি অর্ধেক নিয়ে সে বেরিয়েছে দিল্লীর চাকরিটাকে ধবত্তে। এক সময় সে ঈশ্বব-টিশ্বব বিশ্বাস করতো। আজকাল আর করেনা। সব ব্লাফ্।

আজ সে ট্রেনের বাঙ্কের ওপর শুয়ে মনে মনে বললো : মার ইচ্ছেটাই যেন পূর্ণ হয়, ঠাকুর।

ভুলে কপালে-হাতজুটোও ঠেকিয়ে ফেলেছিল সে। হঠাৎ তার মনে পড়লো, সামনের বাঙ্কে শবরী শুয়ে আছে। সে তার এই ব্যাপারটা দেখে ফেলেনি তো ? ঘাড় তুলে শবরীকে দেখে। শবরীর সমস্ত শবীরের ওপর দিয়ে ট্রেনের শব্দ ছুটে চলেছে। মাঝেমাঝে জানলা গলে উড়ন্ত স্টেশনগুলো তার শরীরের যৌবনের ওপর আলো ফেলে ছুটে পালাচ্ছে হাসতে হাসতে। তার তখন হরশংকরবাবুর ঝড় মেয়ে তন্দ্রাদিব কথা মনে পড়ে যায়। বুকের ওপর নরম স্পঞ্জের মতো একটা অনেক দূরের স্পর্শ। নীলু সেই প্রথম জেনেছিল, সেই স্পর্শের হুঃখ কী চূড়াগু ! ঘুমন্ত শবরীর দিকে সে তাকায়, এখন তার বুকের ভেতর নীলশিখার সেই কেরোসিনের পলতেটা রি-রি করে জ্বলতে

থাকে। অনেক দিন থেকেই নীলু জানে, একটা গোপন অশুখ তার বৃকের মধ্যে পিঁড়ি পেতে বসেছে, কুচি কুচি করে খাচ্ছে তার ছৎপিণ্ডের মাংসগুলো।

শবরীর দিকে তাকিয়ে নীলু তল্লাদির কথা ভাবছিল। সব মেয়ের বৃকের ভেতরই কি তল্লাদি লুকিয়ে আছে? এতক্ষণ মনে হয়নি। এখন তার বৃকের ভেতরটা অনেক দূর পর্যন্ত জলছে, হাতের তালুছুটো ঘামছে সমানে।

সকালে শবরীই বললো : কাল সারারাত আপনি ঘুমোননি।

সে কি? শবরী তা জানলো কি করে? তাহলে শবরীও কি কাল সারারাত ঘুমোয়নি? নইলে সে কি করে জানবে?

: সারারাত আপনি ছটফট করেছেন, বিড়বিড় করেছেন, আরো কত কি—?

না না শবরী, তুমি বলো, তুমি আর কিছু ছাখোনি, আর কিছু জানোনা। সে আমার বৃকের অশুখ, আমার একটা গোপন অশুখ। সে কারো জানার কথা নয়, সে তুমি জানবেনা, তুমি বুঝবেনা। আর তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা। তারপব এই পুকোচুরি খেলার শেষ। চলে যেতে যেতে তল্লাদির মতো ডেকে বলে যাবে : ছয়ো ছয়ো, খেলতে পারেনা—

গলার ছ'পাশ আঠালো হয়ে আটকে আসছে। তার কিছু শবরীকে বুঝতে না দিয়ে সে বলে : ট্রেনে আমার ঘুম আনা না।

শবরী হেসে বলে : আমার কিন্তু উল্টোটি। ট্রেনে উঠলেই ছ চোখ বন্ধ হয়ে আসে।

চোখ নাচালো শবরী।

নীলুর গলা শুকিয়ে কাঠ। এখন একটু জল খেতে হয়। শবরীর কুঁজোয় ঝাঁকুনি দিয়ে দেখলো, ওতে একফোঁটা জল নেই।

শবরী বললো : ট্রেনটা কোন স্টপেজে থামছে মনে হয়। একটু জল ভরে আনুন না, প্রীজ্।

ট্রেনটা সত্যি সত্যি স্টেশনে থামলো। জলের কলে প্রচণ্ড ভিড়।

লম্বা লম্বা পা ফেলে নীলু জলের কলের কাছে এগিয়ে গেল। একটা মাত্র কল, তার ওপর এক ঝাঁক মানুষ হামলে পড়েছে। এখানে ট্রেন কতক্ষণ থামবে, তাও নীলুর জানা নেই। কিন্তু এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে জীবনেও জল জুটবেনা কপালে। ওদিকে ট্রেনও ছেড়ে দেবে। সে কলের দিকে এগোবার চেষ্টা করে। এমন সময় কে যেন বললো, সিগন্যাল দিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ও পাতলা হতে শুরু করলো।

নীলু কুঁজোটা সবে কলের মুখে ধরেছে, গার্ডের হুইশল শোনা গেল। জল পড়ছে তো পড়ছে। ট্রেনের চাকাও ঘুরলো। নীলু কুঁজোয় জল ভরছে। তার মনে হলো, যেন অনেক দিন সে এইভাবে জল ভরছে। কিন্তু কিছুতেই ভর্তি হচ্ছে না তাব হাতের কুঁজোটা। ভর্তি হতে তখনো বাকি। চাকা ঘুরছে। তখন নীলুব মনে পড়লো, গাড়িতে শবরী আছে। কাল দিল্লীতে তার নিজের ইন্টারভিউ রয়েছে। বাবাব বোতাম বিক্রির টাকায় সে দিল্লী যাচ্ছে। তখন সে একহাতে কুঁজো ঝুলিয়ে নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে ছুটতে লাগলো। গেটের কাছে শবরী এসে দাঁড়িয়েছিল। হয়তো একটু ভয়ও পেয়ে গিয়েছিল সে। নীলুব হাত থেকে কুঁজোটা কেড়ে নিলে সে বললো : শীগ্গীব উঠে পড়ুন। স্পীড্ বাড়ছে—

নীলু ট্রেনের পাদানিতে পা রেখে হাসি-হাসি মুখ করে বললো : খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, না ?

: না না, আপনার চোখমুখের চেহারা দেখে আমার ভীষণ হাসিই পাচ্ছিল। ট্রেনে ‘এলার্ম চেইন’ আছে, তা বুঝি জানতেন না ?

শুনে নীলুব মনে মনে খুব রাগ হলো। ওরকম অবস্থায় পড়লে সবারই চোখমুখ শুকিয়ে যায়। এতে হাসির কি আছে ?

শবরী বলে : সত্যি যদি উঠতে না পারতেন, তাহলে—

: আপনি ‘চেইন’ টানতেন।

নীলুর কথায় শবরী শব্দ করে হেসে উঠলো। নীলুর রাগটাও নেমে একেবারে জল হয়ে গেল। হুজনে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে

খেল। তারপর হঠাৎ শবরী বললো : কলকাতায় ফিরলে আমাদের বাড়ি আসছেন তো ? মা কিন্তু আপনাকে দেখলে ভীষণ খুশী হবে।

নীলু ঠোঁট বেঁকিয়ে বললো : আপনি কি ঠিকানা দিয়েছেন ?

শবরী বলে : দিন তো আপনার ডায়েরীটা।

: আমার কোন বিশ্ব-সুন্দরীর অটোগ্রাফ চাইনা।

: বেশ। আমিও বিশ্ব-সুন্দরী নই ; দিন। আর যদি ঠিকানা

না চান, তাহলে অন্তকথা—

: ঠিকানা ছাড়াই আপনাকে খুঁজে নিতে পারবো।

: বারে, কি করে ?

: শাস্তিঘোষ স্ট্রীটের মোড়ে।

নীলু ডায়েরীটা স্টুটকেশ থেকে বের করে দিল।

: দেখুন, পাতা গুল্টাবেন না। অনেক প্রাইভেট—

শবরী ঠিকানা না লিখে পাতাই গুল্টাতে লাগলো। সব সাদা।

: একি ! একটা নামও নেই ?

: কার ?

: কার আবার ?

শবরী তার নাম-ঠিকানা লিখলো।

: নিন, বাঁধিয়ে রেখে দেবেন।

নীলু ডায়েরীটার পাতা খুলে শবরীর নাম-ঠিকানা পড়ছিল। না, পড়ছিল না ; হাতের লেখাটা দেখছিল। শবরীর চোখছুটো ততক্ষণ নীলুর মুখের রেখা পড়বার চেষ্টা করছিল। ডায়েরীটা স্টুটকেশে রাখতে রাখতে নীলু বললো : আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। তারপর ঠিকানা খোঁজার পালা।

শবরী মুখটা কক্কণ করে বলে : সত্যি। বেশ কাটলো একটা দিন। আচ্ছা, আপনি দিল্লীতে কোথায় উঠবেন ?

: কিছু ঠিক নেই। হয় স্টেশনে, না হয় কালীবাড়ি—

: কেন ? অবিনমামার ওখানে চলুন না ।

: লাঠি নিয়ে তাড়া করবে ।

: না স্তার, অবিনমামার মতো মানুষ হয় না । স্টেশনে দেখলেই বুঝতে পারবেন ।

: দেখা যাক তাহলে—

নীলু এবার দিল্লীতে একটা আশ্রয়েব ভরসায় খুব আশাবৃত্ত হয়ে ওঠে । বলে : আপনি যাচ্ছেন, আপনার অবিনমামা জানেন তো ?

সঙ্গে সঙ্গে জোব দিয়ে শববী বলে : তা না জানিয়ে আমি যাচ্ছি ? কাকু টেলিগ্রাম কবে দিয়েছে ।

: আপনি যাচ্ছেন, টেলিগ্রামে বলা হয়েছে । আব কেউ সঙ্গে যাচ্ছে, তা তো ঠঁবা জানেন না ।

: থামুন তো । সব 'ম্যানেজ' হয়ে যাবে ।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ । ওপাশে কাবা তাস খেলছে । শুধু ওদের 'কল'গুলো এবং মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন সংলাপ ভেসে আসছে ।

শববী একদৃষ্টে নীলুব মুখের দিকে চেয়ে কী ভাবছিল । নীলু জিজ্ঞেস কবলো : এ কী, শেষের দিকে আপনি এমন ড্যাম্প মেবে গেলেন কেন ? ভয় নেই, আমি যাবোনা আপনার অবিনমামার বাড়ি ।

মাথা ঝাঁকিয়ে শববী বললো : না না, আমি ওকথা ভাবছি না ।

: কি ভাবছেন তাহলে ?

: ভাবছি, যদি টেলিগ্রাম পৌঁছে না থাকে—?

হেসে নীলু বললো : টেলিগ্রাম নিশ্চয়ই পৌঁছে থাকবে ।

হঠাৎ থেমে শববীর সামনে সে ছোটো আঙুল বাড়িয়ে ধরে বলে : ধরুন তো ।

শববী ঘাবড়িয়ে যায় । একটু ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করে : কি করতে হবে ?

: আঙুল ছোটোর যেকোন একটা ধরুন ।

শবরী তর্জনীটা ধরতে যাচ্ছিল। ওটা না ধরে মধ্যমাটা ধরে নীলুর মুখের দিকে তাকায়।

নীলু মাথা ছলিয়ে বলে : না, পায়নি।

: কি ?

: টেলিগ্রাম।

: আপনি আমাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন কিন্তু।

নীলু গম্ভীরভাবে বলে : না, ভয় পাবেন না। ভয় পাবার কি আছে ?

: আমি ভয় পাচ্ছিই না। আমি মামীর কথা ভাবছি। মামীকে কখনো দেখিনি তো। পাঞ্জাবী মেয়ে। জানিনা, কেমন মানুষ হবে।

সোনার চেইন-পরা সেই অবাঙালী লোকটা এতক্ষণ শবরীর সিটের একপাশে বসেছিল। নীলু সেজাগে কিছু ভাবেনি। সারারাত প্রভুভক্ত কুকুরের মতো সে পাহারা দিয়েছে বলে কি দিনের বেলায়ও শবরীকে পাহারা দিতে হবে ? সে জানাজার ভেতর দিয়ে ছুটস্তু পাহাড়, গ্রাম, মাঠ - এই সব দেখছিল। এবং ভাবছিল, কাল দিল্লীতে তার ইন্টারভিউ। কেমন প্রশ্ন করবে, কে জানে ? মার ইচ্ছেটা পূর্ণ হবে তো ?

হঠাৎ শবরী তার সিট ছেড়ে নীলুর পাশে এসে বসলো তার দৃষ্টিকে আড়াল করে।

: আপনি ও সিটে যান তো।

: কেন ? কি হলো ?

শবরী নীলুর কানে কানে বললো : লোকটার বকম-সকম মোটেই ভাল নয়। বোধহয় ড্রিংক করেছে। মুখে মদের গন্ধ।

অসম্ভব নয়। লোকটা একটা কিটস্বাগ নিয়ে কাল রাত থেকে বাববাব ল্যাট্রিনে যাচ্ছিল। নীলু শবরীর সিটে গিয়ে বসলো। ঠিক। শবরীর কথাই ঠিক ভক্ ভক্ করে গন্ধ বেরচ্ছে লোকটার মুখ থেকে।

শবরী নীলুর দিকে চেয়ে চোখ নাচালো। নীলু তার জবাবে
নাকে রুমাল চাপা দিল। তা দেখে শবরী শক করে হেসে
উঠলো।

লোকটা বুঝতে পেরেছিল বোধহয়। তা নইলে খানিক পরে
তার নিজের সিটে উঠে চলে যাবে কেন? শবরী চোখ টিপে
হাসলো। নীলুও পকেটে হাতের রুমালটা গুঁজে রাখলো।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে শবরী বললো : কাল তো আপনার
ইন্টারভিউ, না? দাঁড়ান, আপনাকে আমি একটা টিপ্‌স্ দিয়ে
দিচ্ছি।

নীলু ঝুঁকে বসলো।

শবরী তার সামনে তার 'নেল পালিশ' লাগানো ছটো স্মল্লর
আঙুল এগিয়ে ধরলো।

: ধরুন, যেটা খুশি—

নীলু তার তর্জনীটাই চেপে ধরলো।

: উঃ, ছাড়ুন; লাগছে—

: উহু, আগে বলুন—

: কি?

: টু বি অর নটু টু বি?

: টু বি—

নীলু শবরীর আঙুল ছেড়ে দিল।

শবরী আঙুলটায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে : আঙুলটায়
ব্যথা ধরিয়ে দিয়েছেন। যেমনি ব্যথা ধরিয়ে দিয়েছেন, বেডিংটা
তেমনি আপনাকেই বেঁধে দিতে হবে।

: আর বোধহয় বেশি দেরি নেই, না?

বেডিং বেঁধে সব রেডি করে ওরা বসেছিল। নতুন দিল্লী স্টেশনে

ট্রেন পৌঁছোলো। কুলি ডেকে মালপত্র নামাতে নামাতে শবরী জিজ্ঞেস করলো : খুব খারাপ লাগছে, না ?

ম্নান হেসে নীলু বললো : বেশ কাটলো একটা দিন। মনে থাকবে।

প্লাটফর্মে নেমে ছুজনে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলো। বিরাট লম্বা প্লাটফর্ম। তার ওপর এত লোকের ভিড় যে, বিশেষ কাউকে খুঁজে বের করা একটা অসম্ভব ব্যাপার। 'সি-অফ্' করার মতো 'রিসীভ' করার জগ্গেও বহুলোক প্লাটফর্মে ভিড় জমিয়েছে। তার ভেতর শবরী কোথাও তার অবিনমামাকে খুঁজে পেলো না। ক্রমে প্লাটফর্মের ভিড় এবং ব্যস্ততা ফিকে হয়ে এলো। কোথাও অবিনমামাকে দেখতে না পেয়ে শবরীর মুখ শুকিয়ে এলো।

: আপনার কথাই ঠিক হলো। অবিনমামা টেলিগ্রাম পায়নি।



টাঙায় কবে ওরা অবিনমামার কোয়াটাঁরে গেল। গেটে টাঙা
রেখে ভেতরে গিয়ে ওরা দেখলে, দরজায় তালা ঝুলছে; শুধু
একপাশে ছোট একখানা অ্যাস্বেটোসের ঘরে সতরঞ্চি বিছিয়ে কটা
দারোয়ান গোছের লোক জুয়া খেলছে। চারপাশে পরিত্যক্ত মাটির
ভাঁড় এবং গুমোট-করা বাতাসে চাপা মদেব গন্ধ।

শববীৰ মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। অবিনমামাব কোয়াটাঁবে এসে
এই দৃশ্বে তাব মনটা একেবানে কুকড়ে গেল। কলকাতায় রোজ
খুনোখুনি, বোমা, হামলা—এসব থেকে পালিয়ে আসবাব জন্তে সে
পবীক্ষা শেষ হতেই ছুড়মুড় কবে বেবিয়ে পড়েছিল। একটিবাবও
ভাবেনি, নামা-মামীমা যদি না থাকে, তাহলে কী হবে! মামা-
মামীমা যে দিল্লী থেকে কোথাও চলে যেতে পারে, তা কখনে
তাব মনে আসেনি

মনে পড়লো, মামা তাব গাড়েয়ালী দাবোয়ান পতাপ সিংকে
নিয়ে খুব মজা কবে চিঠি লিখেছিল কয়েকবাব। সজ্জা প্রতাপ
সিং নামটা তাব মনে ছিল। চিঠিতে প্রতাপ সিংযেব চেহাৰা এব
বিশাল গৌকেন স্বদীৰ্ঘ বৰ্ণনা প্রায়ই থাকতো। চেহাৰা মিলিয়ে
শববী একফনকে ডেকে বললো, তুমিই কি প্রতাপ সিং?

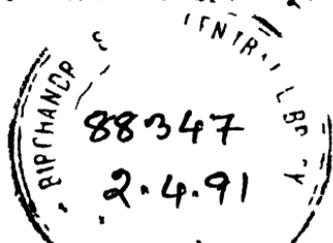
প্রতাপ সিংযেব উঠে দাঁড়াবাব শক্তি ছিল না। সে কোনবকমে
দবজাব পান্না ধবে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, জী হাঁ

• মামা-মামীমা কই ?

• সাত্তেব আউব মেমসাব ?

• হ' ?

প্রতাপ সিংযেব কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। চাথুটো বন্ধেব
মতো লাল মেছাজও খুব শবীক্ষ ছিল না সে যা বললো, তা



থেকে বোঝা গেল, সাহেব-মেমসাব এক সপ্তাহের জন্তে মুসৌরি গেছে। ফিরতে এখনো তিন-চার দিন বাকি।

শবরী তাকে তার বাংলা এবং অনভিজ্ঞ হিন্দী দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলো যে; সে তার সাহেবের দিদির মেয়ে। সে আসছে, টেলিগ্রাম করা হয়েছিল। এখন সে এসে পড়ছে। তার থাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রতাপ সিং জানালো, সে সব সম্বন্ধ নিয়েছে। লেकिन চাবি সাহেব-মেমসাবের পাশে আছে। টেলিগ্রাম তাকে মিলেছে। এখন সে কি করতে পারে?

তুর্ধ্ব প্রতাপ সিংয়ের কর্ণস্পর্শী গৌফ বিনয়ে আনত হলো। বিগলিতভাবে বললো : হামারা ইয়ে কোঠি হাম্ ছোড় দেনে সেক্তা। উসমে কোই আসান হোগা ?

স্বভাবতই প্রতাপ সিংয়ের সাকরেদরা এই প্রস্তাবে খুশী হতে পারছিল না। তাছাড়া, এই প্রস্তাবে শবরীও রাজী হতে পারলো না। সে মুখ শুকিয়ে নীলুর মুখে তাকালো। সে বললো : চলুন, কালীবাড়িতে খোঁজ নিয়ে দেখা যাক। তিন-চারটে দিন ওখানেই কাটিয়ে দেবেন।

টাঙা ছুটলো কালীবাড়ির দিকে। কালীবাড়িতেও জায়গা নেই। শবরী সমস্ত খুলেই বললো। কিন্তু না, কোন উপায় নেই। শেষে টাঙার কাছে ফিরে এলো তারা। টাঙাওলা ব্যাপারটা বুঝেছিল। সে বললো : বাবুসাব হোটেলমে চলিয়ে।

হোটেল? সে তো অনেক টাকার ব্যাপার? নীলু শবরীর মুখের দিকে তাকালো। শবরীর কাছে ফেরার ভাড়া, আর কিছু বাড়তি টাকা আছে। কিন্তু তা-ই বা কতটুকু? নীলুর কাছেও আছে ঐরকম। শবরী ভাবলো, তাতে হোটেলের ওঠা কি ঠিক হবে? ফেরার টাকা খরচ করে ফেললে শেষে যদি মামার ফিরতে দেরি হয়? ঠিক আছে, মামার রেফারেন্স দিয়ে মামা-মামীমার ফিরে আসা পর্যন্ত সে হোটেলের থাকবে। তারপর যা

হয়, হবে। না হয় চয়নকাকুর কাছে সে টেলিগ্রাম করে দেবে একটা।

হুজনে টাঙায় উঠলো। দরিয়াগঞ্জে হোটেল। অনেকখানি পথ। পৌঁছতে রাত হয়ে গেল। দোতলায় কোণের দিকে একখানি ডবল সিটের ঘর পাওয়া গেল—ডেইলি চব্লিশ টাকা—মাথাপিছু কুড়ি। নীলু শবরীকে বললো : আপনি এখানে থাকুন, আমি অন্য কোথাও ‘ম্যানেজ’ করে নেবো।

শবরীর চোখছুটো কপালে উঠলো। বললো : না, তা হয় না। আজকের দিনটা অন্তত এখানে থাকি, তারপরের কথা কাল ভাবা যাবে। ভীষণ বিজ্ঞী লাগছে সব। ইস্, এমন হবে জানলে আসতাম না।

এই বেশ। নীলু ভেবেছিল, স্টেশনের ওয়েটিং রুমে, বা কালী-বাড়ি না হয় তো কোন ধর্মশালায় ছুটো দিন কাটিয়ে দিয়ে সে কলকাতায় ফিরে যাবে। কিন্তু পেয়ে গেল একটা নামকরা হোটেলে থাকার সুযোগ। তার ওপব নিঃসঙ্গতা নয়, সঙ্গে শবরী—যার সঙ্গে ছুদিন আগেও তার কোন পরিচয় ছিল না। তার কাছে সবটাই অবিশ্বাস মনে হচ্ছে। সে নিজেকেই যেন বিশ্বাস কবে উঠতে পারছে না। সামনের ডেসিং টেবুলের বিরাট আয়নায় সে নিজের সবটাই দেখতে পাচ্ছে। আয়নায় ঐ লোকটাই কি কলকাতার গ্রে স্ট্রীটের লাজুক মুখচোরা নীলু?...যার বৃকের ভেতরে একটা কেরোসিনের নীলশিখাখুব গোপনে জ্বলে, মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে যার হাতের তালু জব জব করে ঘেমে ওঠে? সে বিশ্বাস করতে পারছে না ঐ বিশাল আয়নাটাকে, এই নরম বিছানাটাকে, আর সামনের ঐ শবরীকে।

শবরী বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো। এলোমেলো-করে-পরা কাপড়ের কোণটা মাটিতে লুটোচ্ছে। তাতেই অপূর্ব লাগছে

শবরীকে। ঘুম ভেঙে সে এতক্ষণ বাথরুম থেকে শবরীর জল ঢালার শব্দ শুনছিল। কালও রাতে ঘুম আসছিল না তার। কালও বৃকের ভেতরটা তার রি-রি করে জ্বলছিল। সেই সঙ্গে হাতের তালুতে ঘামের দরানি। খুব গরম লাগছিল তার। ভোরের দিকে একটা মিষ্টি হাওয়া বইছিল। তারপর কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে, জানে না।

চোখ নাচিয়ে শবরী জিজ্ঞাস করলো : ঘুম ভেঙেছে ? উঠে পড়ো—টেবিলের ওপর চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

: হোক।

বৃকের নিচে বালিশটাকে নিয়ে সে কালকের ঘটনাগুলো ভাববার চেষ্টা করে। শবরী তাড়া দেয় : ওঠো, আজ না তোমার ইন্টারভিউ ?

তাইতো ? নীলু ভুলে গিয়েছিল সে কথা। তার বাবার বোতাম বাঁকুর টাকায় সে ঐজন্মেই তো দিল্লী এসেছে। তার বাবা মারা গেছে। মার সাদা হাত ছুথানাও মনে পড়লো তার। টেবিলের ওপর ট্রে-তে টি-পটের মুখ থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। নীলু আর দেরি না করে উঠে পড়লো। ত্রাশ নিয়ে বাথরুমে ঢুকে কয়েক মিনিটের মধ্যে মুখ ধুয়ে বেরিয়ে এসে দেখলো, শবরী স্ট্রিকেশ থেকে একখানা পাটভাঙা শাড়ি পরছে। থমকে দাঁড়িয়ে যায় সে। তার সমস্ত শরীরের রক্ত যেন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল : বৃকের ভেতর সেই জ্বালাটাও ভেসে উঠছে।

শবরী বললো : বসো। চা ছেকে দিচ্ছি।

নীলু চোখ নামালো। টেবিলে গিয়ে মুখ নিচু করে চা ছাঁকতে লাগলো। টেবিলের সামনে একখানা চেয়ার নিয়ে শবরীও বসলো। চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে বললো : কালও তো সারারাত ছুমি ঘুমোওনি।

: কে বললো ? নীলু জোর দিশ্য বলে : কাল বেশ ঘুমিয়েছি আমি।

: হ্যাঁ ? আমি জানিনা বুঝি ? ভোরের দিকটাই একটু ঘুমিয়েছ। তাই আমি এতক্ষণ ডাকিনি। ভাবনুম, যুমোচ্ছে ঘুমোক।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে শবরী হেসে ওঠে : এ কী চা বানিয়েছ ?

: কেন ? কি হয়েছে ?

: খাচ্ছ তো, বুঝতে পারছো না ?

নীলু চুমুক দিল : না তো—

: একদম চিনি দাওনি।

এতক্ষণে নীলু বুঝতে পারলো, তারও চায়ে চিনি হয়নি। বললো : তাইতো, একেবাবে ভুলে গেছি।

নীলুর কাপে চিনি গুলতে গুলতে শবরী বলে : কী ভাবছো, বলো তো ?

নীলু এতক্ষণ বাদে শবরীব মুখের দিকে তাকালো। বললো : আজ আমার ইন্টারভিউ। সেই কথাই ভাবছি।

ইন্টারভিউ থাকলে কেবল ইন্টারভিউর কথাই ভাবতে হয়। নীলু কিন্তু ইন্টারভিউর কথা ভাবছে না। সে শবরীব কথাই ভাবছিল। বাথরুম থেকে বেবিয়েই সে শবরীকে শাড়ি পরতে দেখেছে। সেই কথাই যুবে ফিরে মনে পড়ছিল তার।

দব্জায় পর্দার আড়ালে বেয়াবার গলা ঝাড়ার শব্দ শোনা গেল। তাকে ডেকে শবরী বললো যে তাবা ন'টার সময় বেরুবে। জরুরী কাজ আছে। জানতে চাইলো, 'মিল' হতে কত দেরি ?

বেয়ারা জানিয়ে গেল বাবোটোর আগে 'মিল' হবে না। এখন ব্রেকফাস্ট করে তারা বেবিয়ে যেতে পারে।

সেই ভালো। নীলু স্নান করে বেরিয়ে এলো। হুজনে ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়লো।

নীলু আপত্তি করেছিল। বলেছিল : আমি যাচ্ছি ইন্টারভিউ দিতে। তুমি যাবে কেন ?

: চলো। একা হোটেল থেকে কি করবো ? তার চেয়ে বরং—

অফিস খুঁজে বের করতে সময় লাগলো। একটা স্কুটার বেশ কিছুক্ষণ ঘুরিয়ে তাদের কনট্‌ প্লেসের একটা অফিসের সামনে নামিয়ে দিল।

বিরাত অফিস। একটা গাঢ় সবুজ রঙের পর্দা লাগানো দরজার ওপরে ইংরেজিতে লেখা 'রিফ্রুটিং অফিসার'। তার সামনে নিপাট কতকগুলি যুবক-যুবতী ঘোরাফেরা করছে। নীলু এবং শবরী ছুজনে গিয়ে একপাশে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ পরে একজন অফিসার গোছের ভদ্রলোক সকলের হাত থেকে ইন্টারভিউ লেটারগুলো নিয়ে গেল। তারপর অনেকক্ষণ আর কারো দেখা নেই, কাবো ডাক নেই—সব চুপচাপ।

নীলু সবার মুখের দিকে তাকায়, একটা বাঙালীর মুখ খোঁজে। কেবল হিন্দী, উর্দু আর ইংরেজির ছড়ানো-ছিটোনো টুকি-টাকি। এখানে-ওখানে সে কান পাতলো। না, কোথাও বাংলার ছিটেফোঁটাও নেই। একজনের বাঙালী-বাঙালী মুখ দেখে সে জিজ্ঞেস করলো : দাদা, আপনি কি বাঙালী ?

: ক্যা ?

: স্মরি, আমি ভেবেছিলুম, আপনি—

ছেলেটা ততক্ষণে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পাশের দেশোয়ালি ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। শবরী ফিক্ করে হেসে ফেললো।

নীলু বললো : ঙাখো, যেন বিদেশে এসেছি। কাশ সঙ্গে কথা বলতে পারছি না। কেউ আমার কথা বুঝতে পারছে না, আমিও কারো কথা—

: সরে এসো।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যথায় পা টন্টন কবছে। একটা বড়ো প্যাসেজ্। একখানাও চেয়ার কিংবা বেঞ্চির ব্যবস্থা নেই। তার ওপর প্রচণ্ড গরম। পকেটের রুমালটা ভিজ্জে সপ্‌সপ্‌ করছে। কর্তারা এখানে দয়া করে কথানা পাখা এবং খান-কয়েক বেঞ্চির ব্যবস্থা করতে পারেনি ? খুজেরি—

নীলু বিরক্ত হয়ে ওঠে। ঘাম মুছতে মুছতে শবরীকে বলে : আমি বললুম, তুমি এসোনা। কষ্ট হবে তোমার। তুমি শুনলেনা। এখন বুঝতে পারছো? এখনি সাড়ে বারো—

পাশে দাঁড়িয়ে শবরী শুধু একটু হাসলো। শবরীও ঘামছে। বললো : আমার কোন কষ্টই হচ্ছে না। শোনো, কার নাম ডাকছে—

না, নীলুর নাম নয়। কে এক রামশরণ সিং—

নীলু বলে : তুমি হোটেলেরে যেতে পারবে?

শবরী ভুরু বাঁকালো : কেন?

: তুমি গিয়ে খেয়ে নাও। আমার হয়ে গেলে আমি আসছি।

কিন্তু মনে মনে নীলু চাইছিল, শবরী থাকুক। যতক্ষণ না তার ইন্টারভিউ শেষ হয়, ততক্ষণ সে থাকুক। ভাঁড়ে করে একটা ছেলে মশলা-দেওয়া চা বিক্রি করছিল। শবরীকে নীলু জিজ্ঞেস করলো : চা খাবে, শবরী?

: তুমি খাবে?

: হুঁ।

: বলা—

ছেলেটাও বাংলা বোঝে না। ভাঙ্গা হিন্দীতে নীলু বললো : ছুটো চা দাও -

দেখতে দেখতে ছুটো বাজলো। ভিড় কমে এসেছে। আর মাত্র পাঁচজন বাকি। বোঝা যাচ্ছে, বেশি সময় লাগবে না। এইবার নীলুর ডাক আসবে। এখন মার মুখ মনে পড়ছে। মার দুখানা সাদা হাত, বাবার চেইন-দেওয়া বোতামের সেট। বাবার স্মৃতি বিক্রি করে সে দিল্লী এসেছে। যেন ইন্টারভিউ সে ভালো দিয়ে যায়।

এ সময়ে বাবার মুখটা মনে করবার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু কিছুতেই বাবার মুখ মনে পড়ছে না তার। বাবা মারা যাবার কয়েক বছর আগে পর্যন্তও সে বাবার কাছে গিয়েছে। অথচ আজ তার

বাবার মুখটা মনেই পড়ছে না। তবে কি সে কোনদিন বাবার মুখ
ভালো করে দেখে নি ?

এবার ডাক এলো। না, তার নাম নয়। কোন এক নতুন
নাম।

আর বাকি একজন। নীলু তাকে ইংরেজিতে জিজ্ঞাস করলো :
হোয়ার ডু ইউ কাম ফ্রম ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর : গোয়া।

তারপর গোয়ার ডাক পড়লো।

এবার নীলুর বুক টিপ্‌টিপ্‌ করছে। গলাটা শুকিয়ে আসছে।
হঠাৎ তার মনে হলো, তার সামনে বাবার চিতার মতো একটা
আগুন জ্বলছে। তার ওপর দিয়ে তাকে অক্ষত হেঁটে যেতে হবে।
খুব হতাশভাবে সে ভয় কাটাবার জগ্গে হাতে সার্টিফিকেটগুলো
নিয়ে নাড়াচড়া করতে থাকে।

গোয়া বেরিয়ে এলে নীলুর ডাক এলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে
তার ইন্টারভিউ শেষ হয়ে গেল। পর্দা ঠেলে বেরিয়ে এলে শবরী
জিজ্ঞাস করলো : কেমন হলো ?

: ধুং—

স্কুটারে বসে নীলু বললো : আমাকে জিজ্ঞাস করলো, ক্রিকেট
খেলতে জানো ? বললুম, জানি। তারপর জিজ্ঞাস করলো, কি
ভালো পারো—ব্যাটিং, না বোলিং ?

: তুমি কি বললে ?

: বললুম, ব্যাটিং। তখন ব্যাটা জিজ্ঞাস করলো, হোয়াই নট
বোলিং ? জানো শবরী, আমি একমাত্র বাঙালী ক্যাণ্ডিডেট্ বলে
আমাকে ইচ্ছে করেই এই প্রশ্নটা করেছে। আমি জানি, এ প্রশ্ন
সার্টেনলি অশ্রু কাউকে করা হয়নি।

একটু থামলো সে। তারপর বললো : বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল,
ইয়েস্, আই ক্যান। বাট্ আউট্ সাইড্ এ ফিল্ড।

তারপর ছজনেই চূপচাপ। শুধু স্কুটারের শব্দ গরম বাতাসের

ভেতর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। খাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে নীলুর মনে হলো, সমস্ত ব্যাপারটাই যেন একটা বিরাট ফাঁকি, বিরাট ধাঙ্গা। এই কটা অবাস্তুর প্রশ্নের উত্তর দেবার জগ্গে এত কষ্ট করে কলকাতা থেকে তার দিল্লী আসা! ইস, কত সস্তায় তাকে তার বাবার মূল্যবান স্মৃতিটাকে হারাতে হলো!

হোটেলে ভাত শুকিয়ে গিয়েছিল। শুকনো ভাতগুলো খেয়ে একটু জিরিয়ে নিয়ে তারা বেরিয়ে পড়লো। নীলু বললো : ইন্টারভিউ তো শেষ হলো। এবার আমার টিকিটটা কেটে ফেলি। চলো, স্টেশনে যাই—

: তাহলে আমি ?

শবরী ভুরু কঁচকালো। নীলু একটু অস্বস্তি বোধ করলো। বড়ো স্বার্থপরের মতো সে তার কলকতা ফেরার কথা বলে ফেলেছে। তারও কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়লো : তাইতো ভাবছি, তুমি কি করবে—

: দিন তিনেকের মধ্যে অবিনমামা এসে পড়বে। এই কটা দিন তুমি থেকে যাও, নীলিম।

: কিন্তু শবরী, এদিকে হোটেলের যে মিটার চড়চড় করে বাড়ছে। আমার কাছে টিকিটের দামটি ছাড়া বিশেষ কিছুই নেই।

নীলু কাল থেকে এই কথাটা বলবার জগ্গে উসখুস করছিল। বারেরবারে কথাটা তার জিভের ডগায় এসে আটকে যাচ্ছিল।

একটু হেসে শবরী বলে : টাকা আমার কাছেও বিশেষ কিছুই নেই। তবে অবিনমামা এসে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

: কিন্তু আমার মামাদের কথাতো শুনলে। অবিনমামার মতো আমার তো কোন মামা এখন দিল্লী আসছে না।

শবরী শক করে হেসে উঠলো। বললো : চলো, তোমার সঙ্গে আজ লাল কেলাটা ঘুরে দেখে আসি।

নীলুর কলকাতা ফেরার কথাটা শবরীর হাসির আড়ালে চাপা পড়ে যায়।

লাল কেল্লার ভেতরে ওরা অনেকক্ষণ ঘুরলো। ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে ব্যাথা ধরে গেল পায়ে। শবরী বললো : আর পারছি না। চলো, কোথাও একটু বসা যাক।

ভেতরের খোলা জায়গায় তারা কমাল পেতে বসলো।

হঠাৎ নীলু কি ভাবে বলে : এই একটা বাড়ি সারা ভারতকে কন্ট্রোল করেছে। ভাবতেও অবাক লাগে—

শবরী সামনের দেওয়ান-ই-খাসেব দিকে চেয়ে বললো : সত্যি -

নীলু বলে : আব এই যেখানে আমবা বসে আছি, এখান দিয়ে একদিন কত সম্রাট, কত যোদ্ধা, কত সুন্দরী হেঁটে গেছে। সামনের ঐ বিল্ডিংটাৰ পাথরগুলো সব দেখেছে

: সব শালা চোর, শালা একটা চোবেব ডিপো—

পেছন থেকে এক বাঙালীৰ বাজুখাই গলার আওয়াজে ওবা চমকে পিছন ফিরে তাকালো। মাঝবয়সী কালো একটা লোক, কাঁচাপাকা মাথাৰ চুল, ধুতি-পাঞ্জাবী-পরা, কাঁধে খদ্দবেব পাটকবা সাদা একখানা চাদর। হাতে বাদামী বেণেব একখানা ছড়ি।

নীলু আব শবরীকে ওঁব দিকে ঘাড় ফিৰিয়ে থাকতে দেখে ভদ্রলোক উৎসাহিত হয়ে বলে চললেন : এরা চোব, এদের বাবারা চোর, এদের ঠাকুরদাবাও—

শবরী নীলুর কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললো : ইনি নিশ্চয়ই সম্রাট শাজাহান।

নীলু আজ এখানে একজন বাঙালীকে পেয়েছে। সে মুখ খারাপ করে যা-ই বলুক, বাংলা ভাষা তো। কর্কশ গলায় তা-ই শুনতে ভালো লাগছে। যেন মধুঢালা।

সে ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করে : কাদের কথা আপনি বলছেন ?

হাতেব লাঠিটাকে তরবারির ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে এনে উনি বললেন :

দিল্লীর সব শালাই চোর। শুধু চোর নয়, জোচ্চোর, বাটপাড়, গাঁটকাটা, চিটিংবাজ—দিনেছপূরে ডাকাতি করে। আর বাঙালী দেখলে—

বলে ডান হাত থেকে লাঠিটা বাঁ হাতে নিয়ে বলে চললেন : দিল্লী যখন পরের পয়সায় এসেছি, ভাবলাম হরিদ্বারটা আর একবার সেরে যাই। স্কুটারে উঠলাম, টিকিট কাটতে যাবো। বললাম, আজমীর গেটে নিয়ে চল। রাজেশ্বরপ্রসাদ রোড থেকে আজমীর গেট পঞ্চাশ পয়সার বেশি নয়। ব্যাটার স্কুটার চলেছে তো চলেছে। মিটারে পাঁচ টাকা উঠে গেল। তাই দেখে চোখ কপালে উঠলো আমার। বললাম, এ কোথায় নিয়ে যাচ্ছি? বললো, কিঁউ? কাশ্মীর গেট? ধমক দিয়ে বললাম, আমি তোকে কাশ্মীর গেটে নিয়ে যেতে বলেছি? বলে কিনা, তব্ কাঁহা?

: আমি তোকে তো আজমীর গেট বললাম। বললো : স্মরি। রেগে বললাম : মাথায় পাগড়ি বাঁধার সময় কান দুটো খোলা রাখতে পারিস্ না বাবা? ব্যাটা কথার কোন জবাব না দিয়ে আজমীর গেটে নামিয়ে দিয়ে কান ধরে ছুগালে চড় মেরে দশটি টাকা আদায় করে নিল। মনে মনে বললাম, হরিদ্বার মাথায় থাক, এখান থেকে প্রাণটা নিয়ে ফিরতে পারলে বাঁচি।

ভদ্রলোক চলে যাচ্ছিলেন। নীলু বললো : চলে যাচ্ছেন কেন? বশুন—

ভদ্রলোক ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন : বজ্রালবাবু দেখলেই ওয়া বুড়বাক্ বানাতে চায়।

কৌচা দিয়ে মাটি ঝেড়ে বসতে গিয়ে বললেন : তোমরা কলকাতা থেকে আসছো? কবে এসেছো? কাল?

ত্রিকালপ্তের মতো ভদ্রলোক গড় গড় করে বলে যাচ্ছেন সব কথা। এমনভাবে বলছেন, বিশ্বাস না করেও পারা যায় না।

নীলু বলে : আমাদেরও দিল্লীর অভিজ্ঞতা ভালো নয়।

: কারও ভালো নয়। ভালো হবার কথাও নয়। এখানে শুধু

জালের পর জাল। একটা জাল থেকে বেরিয়ে এলে তো সঙ্গে সঙ্গে আর একটা জালে পা পড়লো। কেবলি জালিয়াতি—

পকেট থেকে নশ্চির কোটো বের করে উনি তার ঢাকনার ওপর জোরে জোরে চাঁটি মারতে লাগলেন।

শবরী নীলুর কানের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করলো: আমাদেরও স্কুটারগুলো খুব ঠকিয়েছে। তাই না?

ভদ্রলোক এবার নাকে নশ্চির গুঁজে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: এত জায়গা থাকতে তোমরা মরতে দিল্লী এলে কেন?

নীলু বললো: শখ করে কি আর এসেছি? নেহাৎ ইন্টারভিউ ছিল, তাই—

রুমাল দিয়ে নাক ঝেড়ে উনি বললেন: তোমরা ইয়ংম্যান-ইয়ংলেডিরা দিল্লী ছাড়া কোথাও ইন্টারভিউ দিতে যেতে পারোনা?

শবরী নীলুর পিঠে চিম্টি কাটলো। নীলুও ভদ্রলোকের কটাক্ষ ধরতে পেরেছে। বললো: ভুল করছেন স্যার, ইনি আমার বোন।

ভদ্রলোক জোরে হেসে উঠলেন। বললেন: এই কে. পি. মিস্তির কোন ভুল করে না হে। যাক, ইন্টারভিউ নিশ্চয়ই ভালো দিয়েছে এবং চাকরিও হয়ে গেছে। এখন কোথায় উঠেছো তোমরা, বলো?

শবরীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন: আমার ইয়ং ফ্রেণ্ডটিকে এ সব কোয়ারি করছি বলে তুমি কিছু মনে করো না, সিস্টার। আমি পুলিশের লোক নই।

জবাব দিল শবরী। সে বললো: মামা-মামীমা মুসোরি গেছে। তাই একটা হোটেলে উঠেছি।

: বা: বেশ। আমি আবার তোমাদের মতো একটু ডেয়ারিং ছেলেমেয়ে বেশি পছন্দ করি। আমার লাইফটাও ভীষণ ডেয়ারিং কিনা। ছিলাম বারাসতের একটা গেছো ছেলে। তারপর কলকাতা, বাঙ্গালোর, দিল্লী, বম্বে, রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর—সে অনেক কথা। সুনন্দরলাল সঙ্গে থাকলে তার কাছ থেকে কিছুটা জানতে পারতে।

: সুনন্দরলাল কে?

নীলু প্রশ্ন করে বসে।

ভদ্রলোক রুমালে শর্ক করে নাক ঝাড়লেন।

: ব্যাটা একটা পাকা শয়তান। যাকে বলে মান্টিমিলিয়োনীয়ার। হাতে গোটা সাতেক ফ্যান্টারী। ওর দিল্লীর ফ্যান্টারীর বয়লার বিগ্‌ড়েছিল। আমাকে 'কল' দিয়ে নিয়ে এলো হাভে-পায়ে ধরে। দুদিন খেটে বয়লার চালু করে দিলুম। এখন ব্যাটার দেখা নেই। কোথায় হাওয়া। পেমেন্ট নেবো, বসে আছি।

একটু খেমে বলেন : আমার কি ? হোটেলে ওর অ্যাকাউন্টে বিল উঠছে। কিন্তু এখানে হোটেলের চার্জ তো মেলা। টাকা-পয়সা আছে তো কাছে ? নাকি যা এনেছিল, সব খতম ?

নীলু এতক্ষণ ভদ্রলোকের সব কথা খুব হালকা মেজাজে শুনে যাচ্ছিল। অনেকটা মজাও পাচ্ছিল সে। কিন্তু শেষের প্রশ্নে সে ভীষণ অবাক হয়ে গেল। এমন মানুষ আবার আজকের পৃথিবীতে আছে নাকি—পাঁচ মিনিটের আলাপের পরেই টাকার প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞেস করে বসে ? নাকি লোকটার মনে কোন অসৎ উদ্দেশ্য আছে ? টাকার তাদের প্রয়োজন আছে। কিন্তু তারাই বা এই লোকটার কাছ থেকে টাকা নেবে কেন ? আর এই লোকটাই বা তাদের টাকা 'অফার' করবে কেন ? কোন উদ্দেশ্যে ?

নীলু অল্প কথা পাড়ে। বলে : আমার ওখানে ওঠার কথা। মামা-মামীমা চলে গেছে মুর্সোরি। কোয়ার্টার গিয়ে দেখি দারোয়ান তার দেশোয়ালি ভাইদের নিয়ে—

: থাক্। এখানকার লাইফ আমার জানা আছে। সব মাতাল আর জুয়াড়ি।

নীলু হেসে উঠলো। বললো : আমার অবশ্য এখানকার লাইফ আপনার মতো জানা নেই। তবে বলেছি তো, আমাদের প্রথম অভিজ্ঞতা খুব খারাপ।

: যাক্, এখানে বসে শুকনো কথা চিবিয়ে কি হবে ? চলো, গেটের কাছে দোকানে বসে একটু চা খাওয়া যাক্—

মনে চা খাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও নীলু আপত্তি করলো : না থাক্ । আমরা তো হোটেল গেলোই চা পাবো—

ভদ্রলোক কিন্তু নাছোড়বান্দা ।

: ধরো, তোমাদের এক বন্ধু তোমাদের চা খাওয়াচ্ছে । গুঠো মিস্টার—

নীলু শবরীর মুখের দিকে তাকালো । শবরী হেসে বললো : উনি এত করে বলছেন যখন—

: আর কোন কথা নয় । গেট আপ, ব্রাদার, গেট আপ—

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ভদ্রলোক হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন । বাইসেব দিকে তাকালেন উদাসভাবে । বললেন : এই লাল কেলা আমরা জয় করতে চেয়েছিলাম ; পাবিনি ।

বাইরে তখন সন্ধে নামছিল । আলো জ্বলে উঠলো চায়ের দোকানে । সন্ধের সত্ত্ব-জ্বালা সেই আলোয় তাঁর অজস্র ভাঁজপড়া মুখখানা থম থম করছিল । তাঁর সামনে ছুজোড়া বিশ্বয়-বিশ্কাবিত চোখ সাগ্রহে জ্বলছিল চায়ের কাপ সামনে নিয়ে ।

: আজ তোমরা আমাকে দেখে চিনতে পাবে না । বারো বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতার একটা চায়ের দোকানে কাজ নিলাম । সেইখানে পড়ে গেলাম এক ভদ্রলোকের কাছে । ব্যস্, ভদ্রলোক আমাকে গুঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন । শুরু করলাম লেখাপড়া । বেশ চলছিল, এমন সময় গুয়ার লেগে গেল । লেখাপড়া ছেড়ে এয়ার ফোর্সে জয়েন কবলাম । কয়েক বছরের মধ্যে পাইলট হয়ে গেলাম । বারাসতের সেই গেছো ছেলেটা তখন ক্যাপ্টেন মিস্তির—ক্যাপ্টেন কে. পি. মিস্তির । একদিন বাস্তিরে অর্ডার এলো—রেজুনে বসিং করে এসো—

শবরী হেসে উঠলো । এতক্ষণ বোঝা যাচ্ছিল, একটা দমবন্ধকরা হাসি শবরীর পেটের ভেতর তোলপাড় করে ফিরছে । আর সে

সামলাতে পারলো না। হাসতে গিয়ে সামনের চায়ের কাপটা সে উল্টে দিল।

: স্মরি—

চায়ের কাপটা নিজেই সে সিধে করে রাখলো।

ভক্তলোক বলে চললেন : বলেছি তো, আমাকে দেখে তোমরা এ সব কথা বিশ্বাস করে উঠতে পারবে না। সেই রাতের অন্ধকারে আমরা দুখানা প্লেন নিয়ে ফ্লাই করলাম। রেঞ্জনের আকাশে পৌঁছে হঠাৎ মনে হলো, এই তো সুযোগ! প্রাণ যদি দিতে হয়, ইংরেজদের হয়ে দেব না। আর কোন কথা নয়। প্যারাসুটে ঝাঁপ দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে জাপানীদের হাতে হলাম অ্যারেস্টেড্। বললাম : আমাকে প্রাণে মেরো না। আমাকে নেতাজীর কাছে নিয়ে চলো। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

দেখা গেল, এবার আর শবরী হাসছে না। টেবিলের ওপর বুক্কে বসে সে ক্যাপ্টেন মিস্তিরের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা খুব মন দিয়ে শুনছে। নীলুও শুনছিল ক্যাপ্টেন মিস্তিরের কথা। শুনতে শুনতে হাই উঠছিল তার। একটা হাই তুলে সে বললো : বলুন, শুনতে খুব ভালো লাগছে—

ক্যাপ্টেন মিস্তির একটিপ নশ্টি নাকে গুঁজে নিয়ে বললেন : ওরা আমাকে নেতাজীর কাছে নিয়ে গেল। আমি নেতাজীর পা জড়িয়ে ধরলাম। বললাম, আমি প্রাণ দিতে এসেছি, নেতাজী। আপনি আমাকে একটা চান্স দিন। নেতাজী আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, বুঝেছি কালিপদ, তুমিই পারবে। ব্যস, আই. এন. এ.-তে চান্স হয়ে গেল। উনিশ শো তেতাল্লিশে কলকাতার হাতিবাগানে বসিং হয়েছিল, জানো? কিন্তু সেই বসিং করেছিল কে?—এই কালিপদ মিস্তির—এই শর্মা!

ক্যাপ্টেন মিস্তির বিগলিত হাসি হাসলেন। পকেট থেকে ক্রমাল বের করে নাক মুছে বললেন : আরো কয়েকটা জায়গায় সাক্সেসফুল্লি বসিং করে ফিরে গেলাম সিঙ্গাপুরে। ঐ সময়

এক মালয়েশিয়ান লেডি—দো এ উইডো—প্রেমে পড়লো আমার। বললো, আমায় বিয়ে করো। আমি বললাম, ক্রীড্ ফার্ট, মেন ম্যারেজ। বললাম, শীগ্গীর দিল্লী যাবো আমরা, লাল কেব্লার দখল নেবো। তারপর সুন্দরী, তোমাকে বিয়ে করে দিল্লী নিয়ে যাবো।

ভদ্রলোক একটু থেমে বললেন : আর একটু চা খাবে তোমরা ?

চায়ের অনিচ্ছা জানিয়ে নীলু বললো : তারপর কি হলো ?

শবরী চুলের বিহুনি সামনে এনে খুলে আবার বিহুনি করছিল। সে সবার অলক্ষ্যে হাত সরিয়ে এনে নীলুর পিঠে চিম্টি কাটলো। নীলু ভদ্রলোককে কিছু বুঝতে না দিয়ে বললো : বলুন বাকিটা। শুনতে ভীষণ ভালো লাগছে—

: তারপরের ঘটনা খুব ছোট। সেবার মণিপুরে বসিং করতে এসে প্লেন ক্রাশ্ হলো। ফিরতে পারলাম না। হস্পিট্যাঙ্গে ছ'মাস শুয়েছিলাম। বুক বিরাট অপারেশন হয়েছিল। ডান হাতেও একটা অপারেশন করতে হয়েছিল। এই ছাখ, তার দাগ—

ডান হাতের তালুর উলটো পিঠটা ওদের সামনে ধরলেন ক্যাপ্টেন মিস্তির। বড় একটা অপারেশন এবং তার সেলাইর দাগ চামড়ার ওপর ভেসে আছে। নীলু আর শবরী অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

একটা নিশ্বাস ছেড়ে উনি বললেন : আই. এন. এ.-র পরের খবর সবই তো তোমরা জানো। ছাড়া পেয়ে কলকাতায় গেলাম। বাবা-মা সবাই গত হয়েছেন। ধরমতলায় বয়লারের একটা ওয়ার্কশপ খুলে সেইখানে বসেছি। বয়েস তো হলো। কিছু করেও তো খেতে হবে। চলো, ওঠা যাক।

বেরিয়ে এসে শবরী ক্যাপ্টেন মিস্তিরকে প্রশ্ন করলো : আপনার কি মনে হয়, নেতাজী বেঁচে আছেন ?

: আলবাৎ আছেন। তাঁকে কোথাও বাইরে আটকে রাখা হয়েছে। আসতে দেওয়া হচ্ছে না। কারণ তিনি এলে যে ভারত-পাকিস্তান এক হয়ে যাবে। তাতে অনেকের অশুবিধে হবে।

‘রেড ফোর্টের গেটের কাছে স্কুটারে উঠতে গিয়ে ক্যাপ্টেন মিস্ত্রির খুব করুণ চোখে ফটকের ওপরের দিকে তাকালেন। ধরা গলায় বললেন : এই লাল কেলা আমরা জয় করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারিনি। দ্রুত মুখ নামিয়ে নিলেন তিনি : যাক্, তোমরা এখন কোথায় যাবে ?

: দরিয়াগঞ্জ।

: ‘ও তো’ সামনেই। চলো আমাকে হোটেল নামিয়ে দিয়ে তোমরা চলে আসবে।

ওঁর হোটেলের সামনে স্কুটার থেকে নামবার সময় ক্যাপ্টেন মিস্ত্রির নীলুর হাতে একটা ভাঁজকরা নোট গুঁজে দিয়ে বললেন : ভাড়াটা মিটিয়ে দিও। আর এই কার্ডটা রাখো। কলকাতায় কখনো মনে পড়লে আমার অফিসে দেখা করো।

নীলু নোট এবং কার্ডটা হাতে নিয়ে জিঞ্জিঙ্গ করলো : কেন ? এখানে ?

ক্যাপ্টেন মিস্ত্রির ঘড়ি দেখলেন। বললেন : আর দেরি করবো না। আজ রাত্তিরেই ব্যাটার পেমেণ্ট করবার কথা আছে। তাহলে কালই চলে যাবো।

স্কুটার ছুটতে শুরু করলো। কার্ডটা খুলে দেখলো নীলু। না, মিথো কথা বলেন নি ক্যাপ্টেন মিস্ত্রির। বয়লার ইঞ্জিনিয়ার—
ধরমতলা স্ট্রীট।

এতক্ষণে শবরী প্রাণ খুলে হাসতে পারলো।

: কী গুল ! কী গুল ! ওরে বাব্বা !

রাস্তার আলোয় নীলু ভাঁজকরা নোটটা খুলেই চমকে গেল।

: শবরী, এ যে দেখি একশো টাকার নোট—

শবরী নোটটা হাতে নিয়ে অবাক হয়ে গেল। আর সে হাসতে পারেনি।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে জেগে নীলুর প্রথমে যার কথা মনে পড়লো, তিনি ক্যাপ্টেন মিস্ত্রি। তাঁর কথা নীলু বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি। কেমন যেন আজগুবি আরব্য উপন্যাসের মতো। শবরীও বিশ্বাস করেনি। কিন্তু ছুজনেই একমত যে, লোকটি অসাধারণ এবং বেপরোয়া। আজ মনে হচ্ছে, তাঁর কথাগুলো হয়তো বা সত্যি; আংশিক হলেও সত্যি। হয়তো এত সত্যি যে, ওদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।

চা খেতে বসে নীলু বললো : চলো, ওঁর টাকাটা ফেরত দিয়ে আসি। আমাদের হয়তো টাকার খুবই দরকার। কিন্তু এভাবে কারো টাকা নেওয়া ঠিক নয়। কি বলো, শবরী ?

: সত্যি।

কাপটা নামিয়ে রেখে শবরী বললো : কিন্তু এমনও তো হতে পারে, উনি দুন্দ করে আমাদের একশে' টাকার নোট দিয়ে ফেলেছেন। ওঁর হয়তো কম দেবাব ইচ্ছে ছিল।

: ঠিক বলেছো। এই বেলা বেরিয়ে পড়া যাক। হোটেল হাড়ার আগেই ওঁকে ধরতে হবে।

তাড়াছড়ো করে ওরা বেরিয়ে পড়লো। হোটেলটা চিনে রেখেছিল ছুজনে। খুঁজে বের করতে কষ্ট হলো না। রিসিপ্-শ্যানিস্টের কাছে ওঁর নাম বলামাত্র উনি বলে উঠলেন : এই তো ঘণ্টাখানেক হলো উনি চলে গেলেন।

নীলু জিজ্ঞেস করলো : হোটেল ছেড়ে ?

: হ্যাঁ।

নীলু শবরীর চোখের দিকে তাকালো। তারপর পাশাপাশি ফিরে চললো। কারো মুখে কথা নেই। গেটের কাছে এসে নীলু বললো : তুমি একটু দাঁড়াও, শবরী। আমি আন একটা কথা জিজ্ঞেস করে আসি।

কাউন্টারের সামনে এসে নীলু রিসিপ্-শ্যানিস্টকে জিজ্ঞেস করলো : আচ্ছা, আপনি কি বলতে পারেন, উনি কিসে ফিরছেন ?

: বাই মেন ।

শবরী কখন এসে নীলুর পেছনে দাঁড়িয়েছিল, নীলু জানতে পারেনি । তাকে দেখে নীলু বললো : এখানে আর কিছু করার নেই । কলকাতায় ফিরে ব্যবস্থা করতে হবে । ঠিকানাটা তো কাছেই আছে ।

হোটেলের পৌছে নীলু নিজের মনে হেসে উঠলো ।

শবরীও না হেসে পারলো না ।

: তাজ্জব লোক কিন্তু একটি—

: সত্যি—

: লক্ষ্য করেছে, কাল আমি ওঁর এতকথা শুনে একটুও হাসিনি—

: আমিও হাসিনি । কিন্তু যখন নেতাজী বললেন, বুঝেছি কালিপদ, আমি জানি, তুমি পারবে, তখন আমি আর—

হাসির তোড়ে তার বাকি কথাগুলো ভেসে গেল ।

দেখতে দেখতে চারদিন । আগের দিন নীলু আর শবরী অবিনম্যমার কোয়ার্টারে গিয়ে ফিরে এসেছে । এবারে গেটের ভেতর থেকে বন্ধ । প্রতাপ সিংয়ের কোন-সাদা পাওয়া যায়নি ।

কিন্তু এভাবে নীলু আর কতদিন এই অপরিচিত মেয়েটিকে গার্ড দিয়ে যাবে ? হাওড়া স্টেশনে ট্রেনে ওঠার পর থেকেই শুরু হয়েছে তার এই গার্ড দেবার কাজ । এবার সে ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়ছে । এবার সে ছুটি চায় । রাতে তার ঘুম আসে না । বুকের সেই নীলশিখাটা ইদানীং বড় বেশি জ্বলে । সমস্ত বুকটাই তার জ্বলে যায় । সারারাত সে শুধু জ্বলতে থাকে আর জল খায় । হাতের ভালুছুটো সমানে ঘামতে থাকে । শবরী তাকে একাধিকবার জিজ্ঞেস করেছে : রাতে তুমি ঘুমোতে পারো না কেন ?

নীলু এই প্রশ্নের কোন জবাব খুঁজে পায় না । কোনদিন সে

তাকে ও প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেও না। সে শুধু শবরীর টানা-টানা চোখছোটোর দিকে নির্নিমেষ চেয়ে থাকে।

: আমার বৃকের ভেতরটা অসম্ভব জ্বলছে, শবরী। আমি রোজ রাত্তিরে মরে যাই, রোজ সকালে আবার বেঁচে উঠি। একই ঘরের মধ্যে শুয়ে থাক তুমি। তুমি কিছুই বুঝতে পারো না, শবরী ? তোমার চোখের সামনে ও আগুন জ্বলে ওঠে, তোমার চোখের সামনে নিবে যায়। আমি চারদিন ধরে পুড়ছি—পুড়ে পুড়ে খাক হচ্ছি। তুমি দেখতে পাচ্ছে না, কেউ দেখতে পাচ্ছে না সে আগুন।

বৃকের ভেতরে কথাগুলো একটা লোভী বেড়ালের মতো ধারালো নখ দিয়ে আঁচড়ায়। রক্তপাতের মতো জ্বালা ধরে পঁজরগুলোর নিচে। চিরকাল সে লাজুক এবং ভীতু। তন্দ্রাদির সঙ্গে লুকোচুরি খেলায় সেকথা 'ও প্রথম বুঝেছিল। আজও সে তেমনি আছে। কোন পরিবর্তন হয়নি তার। কিন্তু বৃকের ভেতর সেই নীলশিখাটা জ্বলে উঠলে তার মনে হয়, যে কোন মেয়ের বৃকে মুখ লুকিয়ে কিছুক্ষণ কাঁদতে পারলে সেই জ্বালাটা হয়তো বা তার জুড়িয়ে যেত।

: শবরী, আমি তোমার প্রভুভক্ত কুকুর, তোমার বৃকের মাঝখানে মুখ রেখে আমাকে একটু কাঁদতে দেবে ?

ধেং। সে এসব কি আজ-বাজে ভাবছে।

হা হা করে হেসে ওঠে সে। শবরী প্রথম দিকে একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তারপর কি ভেবে সেও হেসে ওঠে।

ছপুরে আজ আবার ওরা অবিনমামার কোয়ার্টারে গেল। প্রতাপ সিং আজ একেবারে অন্ধ মানুষ। সেলাম দিয়ে শবরীকে মেম-সাবের কাছে নিয়ে গেল। সাহেব-মেমসাব কাল সন্ধ্যায় ফিরেছেন। নীলু রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। শবরী মামীমার কাছে নিজের পরিচয় দিতেই মামীমা তাকে বৃকে জড়িয়ে ধরলো। উর্মিলা দেবী তাকে এই প্রথম দেখছেন। বিয়ের পর কলকাতায় আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। শবরীর গালে হুঁ খেয়ে ভাঙা বাংলার বললেন : কাল এসেই তোমার টেলিগ্রাম পেয়েছি। রাস্তায় কোন

কষ্ট হয়নি তো? তুমি ওকে ফোন করবে অফিসে? ও খুব খুশী হবে।

উর্মিলা দেবীর বয়স বেশি নয়। শবরীর চেয়ে বছর ছ' সাতেকের বড় হবেন। বেশ সুন্দরী। ববছাট চুল। তা হোক মামীমাকে শবরীর খুব পছন্দ হয়েছে। উর্মিলা দেবী ডায়াল করে শবরীকে কাছে ডাকলেন। শবরী টেলিফোনে অবিনম্যমার গলা শুনে কেঁদে ফেললো।

: মামা, আমি এসেছি--

: তুই কাঁদছিস কেন?

: তুমি কখন অফিস থেকে ফিরবে?

: কদিন ছিলুম না তো। একটু কাজ জমে গেছে। তুই মামীমার সঙ্গে বসে গল্প কর। আমি আসছি।

ফোন নামিয়ে রেখে শবরী মামীমাব দিকে ঘুরে দাঁড়ালে উর্মিলা দেবী হুহাতে তার মুখখানা ধরে বললেন : মুখখানা খুব শুকিয়ে গেছে। কষ্ট হয়েছে খুব, না?

মামীমার 'কষ্ট' শব্দটির বিকৃত উচ্চারণ শুনেও শবরীর চোখ ছাপিয়ে কান্না আসছিল।

: কাঁদছো কেন? বিশ্রাম করো।

তার সব প্রতাপ সিংকে ডেকে উর্মিলা দেবী বললেন : মেমসাবেব লাগেজগুলো নিয়ে এসো।

সঙ্গে সঙ্গে শবরী বললো : ও পারবে না, মামীমা। আমি নিয়ে আসি। ওগুলো স্টেশনে ফেলে এসেছি।

: ও গুলো স্টেশনে ফেলে আসতে হয়? বোকা মেয়ে—প্রতাপ সিংকে সঙ্গে নিয়ে যাও। ও নিয়ে আসবে।

: কোন দরকার নেই, মামীমা। আমি নিজেই নিয়ে আসছি।

চোখ মুছে শবরী বেরিয়ে এলো।

নীলু রোদে দাঁড়িয়ে ঘামছিল। শবরীকে হাসিমুখে ফিরতে দেখে নীলুর মুখ শুকিয়ে গেল। এবার তাহলে খেলা শেষ।

: কি ? ফিরেছেন তো ?

: হ্যাঁ, নীলুগীর চলে। অরিনমামা অফিস থেকে ফেরবার আগেই আমাকে চলে আসতে হবে। বলেছি, আমার লাগেজগুলো স্টেশনে পড়ে আছে। মামা-মামীমার ধারণা, আমি আজই এইমাস্তব আসছি।

স্কুটারে পাশাপাশি বসে শবরী বলে : তুমি কিন্তু কাটকে বলো না।

নীলুর মনের ভেতর দিল্লীর রাস্তাব একটা প্রচণ্ড গরম বাতাস পাক খাচ্ছিল। মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলো : কি ?

: এই যে ক'দিন আমরা একসঙ্গে ছিলাম।

সেই গরম বাতাসটা পাক খেতে খেতে গলা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল। নীলু কথা বলতে পারলো না। রাস্তাব ধারের গাছগুলো সে মন দিয়ে দেখছিল। এই ক'দিন এ পথ দিয়ে সে কতবার গেছে, এসেছে। অথচ এই বিষয় গাছগুলোকে ভালো করে দেখা হয়নি তার। দীর্ঘ গাছগুলো সব পাতা তাদের খুলে ফেলেছে। কংকালের মতো সরু সরু ডালগুলো থেকে শুকনো বাতাস সব রস নিঙড়ে বের করে নিচ্ছে।

নীলুর শুধু মনে হচ্ছিল, শবরী তাকে কিছু বলবে—এই কদিনের ভালো লাগা কিংবা অন্য কিছু। সার্টিফিকেটের মতো সে সেই কথাগুলোকে বাঁধিয়ে বেখে দেবে চিরজীবন।

: তুমি এখন কি করবে, নীলিম ?

নীলিম ? এ নামে তাকে কোনদিন কোন মেয়ে ডাকেনি। তার রক্তের মধ্যে এই ডাকটা পৌঁছোয়। নীলু কেশে গলাটা সাফ করে নেয় বলে : এবার আমি নিশ্চিন্তে ফিরে যেতে পারি।

বোধ হয় 'নিশ্চিন্তে' শব্দটিতে শবরী চমকে তাকালো।

: একা ফিরতে তোমার খুব খারাপ লাগবে, তাই না ? সত্যি, তোমার কথা ভেবে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

এবার নীলু না হেসে পারলো না। বললো : আমি তো একাই

আসছিলুম। ট্রেনে তোমার সাথে আলাপ হয়ে গেল তাই—। নইলে একাই তো আসতে হতো।

: ফিরবার সময় হয়তো তেমনি কারো সাথে আলাপ হয়ে যাবে, দেখে।

নীলুব মুখের দিকে চেয়ে শবরী হাসছিল। নীলু বলে : এসে গেছি, নামো। শীগ্গীর বেরিয়ে পড়তে হবে। আজকের ট্রেনটা ধরতে হবে।

হোটেলের বিল মিটিয়ে দিয়ে বেবিয়ে আসতে ওদের বেশি সময় লাগলো না। এ সময়ে ক্যাপ্টেন মিস্তিরের দেওয়া টাকাটা ওদের খুব কাজে লেগে গেল।

অবিন মামার বাড়ির সামনে স্কুটার থেকে শবরী তার জিনিসপত্র সব নিয়ে নেমে গেলে নীলু বললো : দেখে নাও ভালো করে। আমার সঙ্গে তোমার কোন জিনিস কিন্তু আর নেই।

একটু এগিয়ে এসে নিচু গলায় শবরী বললো : আছে—

নীলু ভুরু কঁচকালো।

: কি বলো তো ?

: মনে পড়ছে না ?

: না—

: আমার ঠিকানসটা ?

: বলো তো, ডায়েরিব পাতাটা ছিঁড়ে দিয়ে যেতে পারি।

শবরীর মুখ শুকিয়ে গেল। ঠোঁট চেপে শুকনো গলায় বললো : ছুমি তা পাবো।

প্রচণ্ড শব্দ করে স্কুটারের চাকা ঘুরলো।

: একদিন আমাদের বাসায় এসো, নীলিম।

: দেখা যাবে—

বলে নীলু ঘাড় ঘুরিয়ে নিল। আর সে পেছন ফিরে তাকায়নি।

এমনিই হয়। পথ চলতে গিয়ে এমনি দেখা হয়ে যায় ; আলাপ হয়, মনে হয় বৃষ্টি কতকালের চেনা। আবার ফেলে চলে যেতে হয়। পথের দেখা পথেই ফুরিয়ে যায়। ঠিকানাও হারিয়ে যায়। পৃথিবীর মানুষের ভিড়ে আর কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই সব দার্শনিক কথা ভাবতে ভাবতে নীলু একহাতে টিনের স্কটকেশ, অন্য হাতে সতরঞ্চি-জড়ানো বিছানা নিয়ে সন্দের সময় বাড়ি চুকলো। মীনা গলা সাধছিল। নীলুর ডাক শুনে উঠে এসে দরজা খুলে দিল। কোন কথা না বলে নীলু তার ঘরে চলে গেল। ঘর থেকে সে ধূপের গন্ধ পেল। তাতেই সে বুঝতে পারলো, মা এখন তার শোবার ঘরে ঠাকুরের সামনে বসে বিড় বিড় করে স্তব পাঠ করেছে। নীলুর এই ঠাকুর-টাঁকুর ভালো লাগে না, স্তবও না। কিন্তু এই ধূপের গন্ধ তার ভীষণ ভালো লাগে।

নীলু জামাটা খুলে হ্যাংগারে ঝুলিয়ে দিয়ে বিছানার ওপর গা এলিয়ে দিল। মীনা দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। কথা খুঁজে না পেয়ে সে হঠাৎ বলে ফেললো : জানিস্ দাদা, ওপরের তন্দ্রাদি বরের সাথে ঝগড়া করে চলে এসেছে। আর যাবে না।

নীলু কোন কথা বলে না।

মীনা বলে চলে : বরটা নাকি যা-তা। তন্দ্রাদিকে মারধোর করে। মেরে তন্দ্রাদির কপাল ফুলিয়ে দিয়েছে—

: আচ্ছা, তুই যা। ব্যোমকেশ আসে না ?

ব্যোমকেশ মীনার গানের মাস্টার। নীলু লক্ষ্য করেছে, ব্যোমকেশের সঙ্গে ইদানীং মীনার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ব্যোমকেশের নাম শুনে মীনার মুখের কি রকম পরিবর্তন হয়, তাই দেখবার জন্তে ইচ্ছে করেই সে ব্যোমকেশের কথা জিঃস্বস করলো। না, তার অসুস্থ মিত্যে নয়। ব্যোমকেশের নাম শুনে মীনার চোখের তারাটা

কেমন যেন কেঁপে গেল। বললো : কাল এসেছিল, আজ আর আসবে না।

: কি বলে ? তোর গানের হচ্ছে কিছ ?

: ও তো বলে—হচ্ছে। কিন্তু আমার তো মনে হয় -

: কি মনে হয় ?

: হচ্ছে না।

: হুঁ। যা, গলা সাধ গে যা—

মীনা চলে যাচ্ছিল। নীলু ডাকলো : ইঁাবে, মিলু এখনো ফেরেনি ?

: না।

: কেন ?

: জানি না।

: আচ্ছা যা—

মীনা গেল না। দাঁড়িয়ে রইলো। নীলু তার মুখে তাকাতেই সে চোখ নামিয়ে বললো : দাদা, আমাকে তুই একটা তানপুনা কিনে দিবি ? ব্যোমকেশদা বলছিল, একটা তানপুরো হলে—

নীলু চোখ সরিয়ে নেয়। বলে : চাকরিটা হয়ে যাক্। তখন মনে করিয়ে দিস্—

মীনা চলে যায়। যেতে যেতে ভাবে, দাদা কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে দিন দিন।

মীনা চলে গেলে নীলু কিছুক্ষণ চুপচাপ পড়ে রইলো। তন্দ্রাদির কথা মনে পড়লো। তন্দ্রাদি তো ক'বছর বরের সঙ্গে বেশ ঘর করছিল। তাকে দেখে কখনো তো বোঝা যায়নি, এই বিয়েতে সে সুখী হতে পারেনি। ডগমগে শাড়ি আর কপালে বিরাট সিঁছরের টিপ পরে যখন সে গ্রে স্ট্রীটে আসতো, তখন আইবুর্ডে মেয়েরা সব তাকে দেখে মনে মনে হিংসেই করতো। শেষে সেই তন্দ্রাদিকে কপাল ফুলিয়ে ফিরে আসতে হলো গ্রে স্ট্রীটের অজস্র কৌতুহলী চোখের সামনে দিয়ে ? নাকি সেই ভদ্রলোকও তন্দ্রাদির সাথে

লুকোচুরি খেলায় হেরে গেছে ? 'ছয়ো' 'ছয়ো' করে তার কাছ থেকে ও ছুটে পালিয়ে এসেছে তন্দ্রাদি ?

শবরীকেও মনে পড়ছে নীলুর। কিন্তু ভীষণ আবছা। 'যেন কতকাল আগের দেখা। অথচ এই তো কাল বিকেলেই তাকে তার অবিনমামার কোয়ার্টারের সামনে সে নামিয়ে দিয়ে এসেছে। শবরীর মুখটা মনে করবার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু মনে পড়লো না। এত কাছে থেকে শবরীকে ভালো করে তার দেখে ওঠাও হয়নি।

এমনিই হয়।

আর মনে পড়লো ক্যাপ্টেন মিত্তিবকে। কী আশ্চর্য মানুষ ! নীলু স্থির কবলো, একদিন সে ওঁর অফিসে যাবে। কিন্তু টাকাটা ? আগে একটা চাকরি হয়ে যাক্, মাইনে থেকে একশোটি টাকা সরিয়ে সে একদিন নিয়ে যাবে ওঁকে কেবত দিয়ে আসবাব জঞ্জো।

উঠে বাথরুমে গিয়ে সারা গায়ে জল ঢালতে লাগলো নীলু। মীনা গলা সাধছে। বাথরুম থেকে চমৎকার শোনায়। মনে মনে ঠিক করলো, প্রথম মাসের মাইনে পেলে সে মীনাকে একটা তানপুরো কিনে দেবে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখলো, মা চা-কাটি নিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক একখানি ছবির মতো। মাকে দেখেই নীলুর বুকের ভিতরে যেন একটা ভয়ানক ছুঁচুনি ঘটে গেল। কোন কথা না বলে সে মা হাত থেকে কাপপ্লেট ছুটো নিয়ে বিছানায় গিয়ে বসলো।

: কোন কষ্ট হয়নি, নীলু ? শরীর তোর ভালো ছিল তো ?

: না মা, কোন কষ্ট হয়নি।

আর শরীর ? তুমি আমাকে এ শরীর কেন দিলে, মা ? জন্ম থেকে আমার বুকের মধ্যে একটা গোপন অসুখ রেখে দিয়েছো, যে অসুখের কথা আমি কোনদিন কাউকে বলতে পারবো না। এক এক সময় আমার বুকের ভেতরটা একটা নীলশিখার দমবন্ধ-করা আগুনে

রি-রি করে জ্বলতে থাকে। আমি কোনদিনই ভালো থাকবো না, মা।
এ অসুখ নিয়ে আমি বেশিদিন হয়তো বাঁচবোও না।

মা ঠায় দাঁড়িয়েছিল। খালি কাপপেট ছোটো নীলুর হাত থেকে ধরে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো : কেমন ইন্টারভিউ দিয়ে এলি ?

নীলু সংক্ষেপে বললো : এই এক রকম।

: হবে মনে হয় ?

: খুব একটা আশা নেই, মা।

মা আরো কিছু সময় দাঁড়িয়েছিল। হয়তো নীলুর মুখ থেকে কোন আশার কথা শুনবে বলে। মা মুখ শুকিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে নীলু বললো : হলে মাসখানেকের মধ্যেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আসবে।

মা শুনলো, কোন কথা না বলে মুখ নামিয়ে ঘর থেকে চলে গেল। মা বুঝে নিয়েছে, চাকরিটা তার হবে না। কেন সে মাকে বললো, খুব একটা আশা নেই। বললেই তো হতো, চাকরিটা একমাত্র তারই হবে। কাল কিংবা পরশু তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এসে যাবে। কিন্তু মাকে সেই মিথ্যে আশা দেওয়া কি ঠিক হতো ? মা রোজ ভাবতো, আজ নীলুর চাকরির চিঠি আসবে কিংবা ঠাকুরের কাছে মিনতি জানাতো, আজ যেন নীলুর চাকরির চিঠি আসে। কিন্তু সেই চিঠি কোনদিনই আসবে না।

আপসোস হচ্ছে, বাবার সোনার বোতামের ছড়াটা জলে গেল। মিলু যদি তার শেয়ারের টাকায় মানুষের ছ'চারখানা হাড় কিংবা মাথার খুলি কিনে থাকে, সেইটুকুই একমাত্র লাভ।

হঠাৎ তার হাসি পেল। এত টাকা খরচ করে, এত কষ্ট স্বীকার করে দিল্লী গেল সে। মাত্র তিনটি অবাস্তুর প্রশ্ন : ক্রিকেট খেলতে পারো ? কি ভালো পারো—ব্যাটিং, না বোলিং ? হোয়াই নট্ বোলিং ?

একবার সুরোগ পেলে দেখিয়ে দিতুম, ওদের ওই ফল্‌স্ দাঁতগুলো এক ওভারে কতদূর যায়।

গায়ে একটা জামা গলিয়ে নিয়ে সে বেরিয়ে যায়

কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল, নীলু দিল্লী থেকে ফিরেছে। এখনো কোন চিঠি এলো না। যদিও নীলু ভালোভাবেই জানে, সে চিঠি তার আসবে না, কোনদিনই আসবে না, তবু মনে মনে আশা করে সে, পৃথিবীতে অনেক অঘটনই তো ঘটে। এই সামান্য একটা ঘটনা ঘটতে পারে না? না হয় তার নামে একটা চিঠিই এলো।

ঘরের সিলিংয়ের দিকে চেয়ে সে এই কথাই ভাবছিল। এমন সময় চোখে পড়লো ঘবের কোণগুলো একরাশ করে ঝুল আর মাকড়সার জালে ভরে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে ডাকে : মা, মা—

: কেন? কি হয়েছে?

রান্নাঘর থেকে মার গলা শোনা গেল।

: শোনো, দেখে যাও—

মা ভেবেছিল, হয়তো নীলুর কোন চিঠি এসেছে। দিল্লী থেকে। নয়তো কলকাতাও কোন অফিস থেকে। কলকাতায়ও তো সে কম ইন্টারভিউ দেয়নি?

মা খুব ব্যস্তভাবে নীলুব ঘরে ছুটে এসেছিল।

: মা, আমাদের ঘবে এত ঝুল কেন? এত মাকড়সার জাল? আমরা কি এতই ফেলনা?

দেখতে দেখতে মার মুখখানা কেমন শুকিয়ে কালো হয়ে হুয়ে পড়লো।

: এই কথা?

মা আর এক মুহূর্তও দাঁড়ায়নি। কোন কথা না বলে নিঃশব্দে চলে গেল। নীলুর ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। কেন সে মাঝে ঐ কথা বলতে গেল? মাকে এভাবে চলে যেতে দেখে তার মনে হলো, মার কোথায় যেন খুব কষ্ট হচ্ছে। সে কথা মা কাউকে বলছে না। হয়তো

এভাবে কষ্ট পেতে পেতে মা একদিন বাবার মতো চলে যাবে। আর এই ঘরের কোণগুলোয় ঝুল আর মাকড়সার জাল বাড়তে বাড়তে ওদের বিছানায় নেমে আসবে। একদিন দেখা যাবে, ওদের মুখের ওপর মাকড়সারা জাল বুনে দিয়ে গেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মা ফিরে এলো। নীলুর হাতে কয়েকটা টাকা দিয়ে বললো : যা, হরশংকরবাবুকে দিয়ে আয়। পাঁচ মাসের ভাড়া বাকি। বলিস্, মা একমাসেব ভাড়া দিয়েছে। বাকিটা রয়ে-বসে দেবো।

মা এ টাকা কোথায় পেলো, নীলু জিজ্ঞেস করবে, ভাবছিল। কিন্তু মার মুখের দিকে চেয়ে সে কোন কথাই বলতে পারলো না।

মা বেরিয়ে গেলে সে উঠে বসলো। মীনার মাস্টার এসেছে। তার গলা শোনা যাচ্ছে। নীলু হ্যাংগাব থেকে জামাটা নামিয়ে নিয়ে গায়ে দিতে দিতে বেরিয়ে যায়।

হরশংকরবাবুরা ওপরে থাকেন। ওঁদের দরজা এবং ওপরে ওঠার সিঁড়ি ওপাশে। নীলুদের সঙ্গে যোগাযোগ সেইজন্মে কম। বাবা যতদিন বেঁচেছিল, ততদিন ওঁদের সঙ্গে একটা মোটামুটি ভালো সম্পর্ক ছিল। কিন্তু বাবা মারা যাবার পর শুধু ভাড়া দেওয়া-নেওয়া ছাড়া আর কোন সম্পর্কই নেই।

দরজা খোলা ছিল। সিঁড়িতেও কেউ ছিল না। শুধু একটা আব্‌ছা আলো সিঁড়ির অস্তিত্বটাকে স্পষ্ট রেখেছিল। আস্তে আস্তে ওপরে উঠে যায় সে। এই সিঁড়িতে কতদিন ছুদাড় করে তারা লুকোচুরি খেলেছে, কতবার কত আছাড় খেয়েছে। আর আজ এই সিঁড়িটাকে তার সম্পূর্ণ অচেনা লাগছে। এর মধ্যে কতগুলো বছর কেটে গেছে। চোখের আড়ালে বয়েস কত বেড়ে গেছে তার।

কিন্তু ওপরে আজ কেউ নেই। বাড়িতে মানুষ থাকলে বোঝা যায়। সব চূপচাপ, কোন সাড়াশব্দ না থাকলেও বোঝা যায়, বাড়িতে মানুষ আছে। নীলুর মনে হলো, বাড়িটা একেবারে ফাঁকা। কোথাও কাউকে দেখতে না পেয়ে সে ডাকলো : জেঠিমা—

হরশংকরবাবুর স্ত্রীকে নীলু ছেলেবেলা থেকে জেঠিমা বলে ডাকে।

পাশেই কোথায় একটা ঝি ঘর মুছছিল। স্নাতা হাতে বেরিয়ে এসে বললো : বাড়িতে কেউ নেই। সব বিয়েবাড়ি নেমস্তন্ন খেতে গেছে।

: কেউ নেই বাড়িতে ?

ঝিটা নীলুকে চিনতো। বললো : যাও না, ওপরে বড়দিদিমণি আছে।

অর্থাৎ তন্দ্রাদি ? এই সন্ধ্যায় বাড়ির সবাই যখন নেমস্তন্ন খেতে গেছে, তখন একা বাড়িতে তন্দ্রাদি কি করছে জানবার তার খুব কৌতূহল হলো। একবার নেমে যাবে ঠিক করলো। কিন্তু পর মুহূর্তেই একটা অমোঘ আকর্ষণে সে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে লাগলো। অনেক সময় নীলুর এমন হয়। কেন হয়, জানে না। এমন অনেক কাজ সে করে ফেলে, যার ওপরে তাব কোন হাত থাকে না।

সেই চিলেকোঠা। পবিষ্কার কবে রং করানো হয়েছে। বোধহয় তন্দ্রাদির জগ্নেই।

সে দরজার সামনে দাঁড়ালেই ভেতর থেকে তন্দ্রাদি বলে উঠলো : কমলা, হুকটা আটকিয়ে দাও তো—

সেই গলা। স্পষ্ট এবং অমোঘ। নীলুর বৃকের ভেতর সেই নীলশিখাটা দপ্ করে জ্বলে ওঠে। তার বৃকের নিচের পাঁজরগুলো পর্ষস্ত জ্বলে যেতে থাকে। গলাটা আঠালো হয়ে আসে। গলাটা সাফ করে নিয়ে সে বলে : কমলা নয়, আমি, তন্দ্রাদি—

বৃকের ওপর পাতলা একটা কাপড় চাপা দিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো তন্দ্রাদি।

: ও, তুমি— ! আমি ভেবেছিলুম—কমলা। তা বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? ভেতরে এসো—

নীলু আন্তে আন্তে ডাকে : তন্দ্রাদি—

: কি ?

^ : আমি তোমার জামার হুকটা আটকিয়ে দিতে পারি না ?

: কি ?

: ঐ যে তোমার জামার হুক—কমলাকে যা আটকিয়ে দিতে বলছিলে ?

: পারবে ?

: কেন পারবো না ?

: ভেতরে এসো ।

নীলু ভেতরে গেল । তার সমস্ত শরীর কাঁপছিল । প্রায় টলতে টলতে সে তন্দ্রাদির পেছন পেছন গেল । তন্দ্রাদি খুব সাহসী মেয়ে । আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে খসু করে বুকের কাপড়টা নিচের দিকে ফেলে দিল । আয়নার ভেতর দিয়ে নীলুর দিকে তাকিয়ে ভীষণ রহস্যময় হেসে বললো : দাও—

ব্রেসিয়ানের হুকটা আটকাতে নীলুর সময় লাগছিল । একে তার হাত কাঁপছিল ; তার ওপর হৃদিকে টেনে আটকাতে যাবে, এমন সময় তন্দ্রাদি বলে : আর একটু আলগা দাও, নীলু—

নীলু খুব অমুগতভাবে তন্দ্রাদির কথা শুনলো । তন্দ্রাদিকে এভাবে কোনদিন সে জ্ঞাখেনি । তন্দ্রাদি কী সুন্দর ! ওর কর্সা নরম পিঠটাকে নীলুর শুধু ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে । তন্দ্রাদি নীলুকে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এবার শাসনের সুরে বলে : চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাক, ছুঁই—

ব্রেসিয়ানের হুক আটকানো হয়ে গিয়েছিল । তবু অবাক হয়ে নীলু তন্দ্রাদির পিঠের দিকে তাকিয়ে থাকে । সমস্ত শরীর তার টগবগ করে ফুটছিল । যেন একটা নীল ঘোড়া ওর সমস্ত শিরার ওপর দিয়ে ছরস্তু বেগে ছুটে যাচ্ছে ।

: সত্যি তন্দ্রাদি, তোমার পিঠখানা ভীষণ কর্সা ।

তন্দ্রাদি এবার শাসানির সুরে বলে : থাক, হয়েছে । এবার লন্দী ছেলের মতো ছচোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকো । একবারও চোখ খুলবে না কিন্তু ! যখন বলবো, তখন—

নীলু আন্ননার তস্সাদিকে দেখে। আন্ননার সে তো তস্সাদির
ছায়া। ছায়া তো আর আসল তস্সাদি নয়। ছায়াটা দেখতে
আপত্তি কি ?

: বন্ধ করো চোখ—

তস্সাদির আদেশ।

নীলু চোখ বন্ধ করে হঠাৎ চোখ খুলে দেখলো, তস্সাদি তখন
ত্রেসিয়ারের ওপর ব্লাউস্টা পরে কোমরে পেটিকোটের ওপর শাড়িটা
জড়াচ্ছে।

: খুব চুষ্টবুদ্ধি হয়েছে মাথায়, না ?

এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে তস্সাদি ঘরের সুইচটা অক্ করে
দিল।

বুকের মধ্যে একটা প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ড নিয়ে নীলু অঙ্ককারে দাঁড়িয়ে ছিল।
ঠিক একটা জলন্ত গাছের মতো সমস্ত শরীরটা তার এক অদৃশ্য
আগুনে দাউ দাউ করে জলে যাচ্ছে। চামড়া কেটে যেন দরানি রস
গড়িয়ে পড়ছে। ঠিক তখনই বুকের মাঝখানটায় শুকনো খড়ের
দীর্ঘশ্বাসের মতো একটা চিংকার কেটে পড়তে চাইছে তার। এবার
বুকটা সত্যি সত্যিই কেটে যাবে। ততক্ষণ হাতের তালুর ঘামে
মুঠোর ভেতর নোটগুলো ভিজে শ্বাতা হয়ে উঠেছে।

আলো যখন জ্বললো, তখন তস্সাদি সম্পূর্ণ আবৃত।

: তুমি না দিল্লী গিয়েছিলে, কিরলে কবে ?

তস্সাদির কপালে একটা কাটা দাগ।

: তস্সাদি, তোমার কপালে ওটা কি ?

: ও কিছু না। দিল্লীর চাকরি হলো না তোমার ?

: কি করে হবে ? ওখানে তো আর তস্সাদি নেই, যে আমাকে
চাকরি দেবে ?

∴ আমি আবার চাকরি দিই নাকি ?

: দাও না ? আজ যে তুমি আমায় তোমার জামার হুকু
লাগাবার চাকরি দিলে—

তন্দ্রাদি সমস্ত শরীর ঝাঁকিয়ে হেসে উঠলো । হাসলে তন্দ্রাদিকে
কেমন সুন্দর দেখায় । চোখদুটো জ্বল জ্বল করে ভাসতে থাকে,
নাকের ষ্টাটায় ঘাম চিক চিক করে গুঠে ।

: বেশ । রোজ তাহলে এ সময়ে তুমি আমার জামার হুকু
লাগিয়ে দিয়ে যেও । মাইনে—

চোখে চোখ রাখলো তন্দ্রাদি ।

: মাইনে কিন্তু পাবে না ।

আবার তেমনি সমস্ত শরীর ঝাঁকিয়ে হাসি । একটু থেমে
গম্ভীর হয়ে তন্দ্রাদি বলে : বাবা সেদিন বলছিল, তুমি নাকি চাকরি
কবতে দিল্লী গেছ । হলো না চাকরিটা ?

চোখমুখ কুঁচকে নীলু বললো : চাকরি-টাকরি আমার হবে না,
তন্দ্রাদি—

: তবে তোমার কি হবে ?

: তুমিই বলো তন্দ্রাদি, আমাকে দিয়ে কি হবে ?

তন্দ্রাদি এবার অগ্গমনস্ব হয়ে গেল । সে যেন আর নীলুকে
দেখতে পাচ্ছে না । নীলু বললো : কই, বললে না তো ?

: কি ?

: আমাকে দিয়ে কি হবে ?

: তোমাকে দিয়ে কিছুই হবে না ।

তন্দ্রাদি আবার হেসে উঠলো ।

নীলু ভাবে, তন্দ্রাদির ওপর দিয়ে একটা প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে ।
সে ঝড়ের তোড়ে তাকে তার বরকে ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে ।
কপালে জ্বল জ্বল করছে তারই স্মৃতি-চিহ্ন । সে বিয়ের পর স্বামীর
সঙ্গে ঘর করতে গেল । ঘর করলোও কিছুদিন । কিন্তু বেশিদিন
স্থখ সইলো না তার কপালে । কপাল কেটে ফিরে আসতে হলো গ্রে

দিয়ে সেজে-গুঁজে একটা অর্জনা' অচেনা' লোকের সঙ্গে ঘর/করতে
চলে গেলুম। পারলে তুমি ছুঁতে ?

নীলু এবার ঠোট বেঁকালো : বয়ে গেছে আমার ছুঁতে।

সঙ্গে সঙ্গে তন্দ্রাদি জবাব দেয় : সেইজগেই তো সন্ধের অন্ধকারে
গা ঢাকা দিয়ে আমার কাছে বিনে পয়সার চকরি খুঁজতে এসেছো।
আমি কিছু জানি না, না ?

নীলু বলে : মোটেই না। আমি ভাড়ার টাকা দিতে এসেছি।
এই ছাখে টাকা। জ্যাঠামশাইকে বলে দিও, একমাসের ভাড়া দিয়ে
গেলুম। বাকিটা রয়ে-সয়ে দেওয়া হবে, মা বলে দিয়েছে। গুনে
রাখে টাকাটা। জ্যাঠামশাই এলে মনে করে দিয়ে দিও। ভুলো না।

: কে বলবে সেদিনের নীলু ? মুখে যেন খই ফুটছে। আজ
একেবারে একটা জবরদস্ত পুরুষ—এ ম্যান, এ জেন্টলম্যান।

তন্দ্রাদি এও হাসে কেন ? কথায় কথায় হাসি। হাসির তোড়ে
তার সমস্ত শরীরটাই ছলতে থাকে।

: আমি উঠছি, তন্দ্রাদি—

তন্দ্রাদি বলে : বসো, বসো। রাগ করছো কেন ? এই তো সবে
সন্ধে। গুনা গেছে রানাঘাটে। ফিরবে সেই রাত বারোটায়।
এতখানি সময় আমি একা কি করে কাটাই বলো তো ?

নীলু মনে মনে রাগ করে। তুমি কি করে সময় কাটাবে,
তা কি আমি জানি ? তুমি কি আমাকে আজ গল্প করবার জন্তে
ডেকেছিল ? নেহাত ভাড়ার টাকা দিতে এসেছিলুম, তাই। নইলে
এতক্ষণে শান্তি ঘোষ স্ট্রীটের মোড়ে কখন চলে যেতুম।

শান্তি ঘোষ স্ট্রীটের কথা মনে পড়তেই তার শবরীর কথা মনে
পড়লো। তন্দ্রাদির সামনে তার মনে শবরীর ছবি বেশিক্ষণ
টিকলো না। গড়তে না গড়তেই ভেঙে গেল।

তন্দ্রাদি আবার তার চোখে চোখ রাখে।

: আচ্ছা নীলু, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো। তুমি
সত্যি কথা বলবে, দিবি্য করো—

স্ট্রীটের এই বাড়িতে। মীনা সেদিন বলছিল, করটা নাকি খারাপ, তন্দ্রাদিকে মারধোর করে। হয়তো করে, হয়তো সবই সত্যি। এত সব ঘটনা এবং চূর্ঘটনা সত্ত্বেও তন্দ্রাদি এভাবে হাসে কি করে? তবে কি সব মিথ্যে? সব রানানো? লোকটাকে তার ভালো লাগে না, সেই কথাটা সরাসরি না বলে ঘুরিয়ে বলা—আমাকে মারধোর করে। কিন্তু হাসি দিয়ে তন্দ্রাদি সব ভুলতে চায়, চাপা দিতে চায়।

বসতে বসতে তন্দ্রাদি হঠাৎ হেসে উঠলো : ছোটবেলায় তুমি খুব লাজুক ছিলে, নীলু।

তন্দ্রাদির হাসি আর থামে না।

নীলু বলে : এই ঘরটাই, না তন্দ্রাদি ?

তন্দ্রাদি তার কথায় জবাব না দিয়ে হাসতে হাসতে বলে : কি হয়েছে কি হয়নি, অমনি তুমি খেলবো না বলে চলে গিয়েছিলে।

এবার নীলুর হাসবার পালা।

হাসতে হাসতে তন্দ্রাদি হাঁপিয়ে পড়ছিল। হাঁপাতে হাঁপাতেই বলে : সবাই একে একে ডাকতে গিয়ে কিরে এলো। শেষে আমিই গেলুম। ঠোঁট ফুলিয়ে বলা হলো—আমি কক্খনো খেলবো না তোমার সাথে, যাও—।

হঠাৎ নিজেই গম্ভীর হয়ে গেল তন্দ্রাদি। গম্ভীর হয়ে গেলেও তন্দ্রাদিকে ভালো লাগে দেখতে। কেমন ভরাটি মুখ। সব সময় মুখখানা চকচক করে। যেন তন্দ্রাদি এইমাত্র স্নান করে এলো। জলে ভাসা-ভাসা নিটোল মুখ। চোখদুটো সব সময় টলটল করছে। চোখের পাতাগুলো যেন হাসি ও কথার ভারে সব সময় ভারী।

: খেলবে না তো খেলবে না। মাখার দিব্যি দিয়ে তোমার কে খেলতে বলেছে ?

কৃত্রিম অভিমানে তন্দ্রাদি বাচ্চা মেয়েদের মতো ঠোঁট কোলার। নীলুও চোখে চোখ রাখে। তন্দ্রাদি বলে : কেমন তোমার সাধনে

: আমিও তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো। বলো, তার উত্তর দেবে ?

: দেবো। তোমাকেও তেমনি আমার কথার উত্তর দিতে হবে।

: দেবো।

: আমাকে ছুঁয়ে দিবি্য করো, মিথ্যে কথা বলবে না—

তন্দ্রা হাত বাড়িয়ে দিল। নীলু হাতটা ধরেই রইলো। হাতটা ছেড়ে দেবার ক্ষমতা যেন তার নেই। অনেক কাজ করতে হয় তাকে, যাতে তার হাত থাকে না। এও যেন অনেকটা সেই রকম। তন্দ্রাদির হাতটা ছেড়ে দিয়ে তার যে এখন সোজা হয়ে বসার কথা, তার সে খেয়াল নেই। এদিকে কোথায় যেন বনে ভীষণ আগুন লেগেছে। তার বৃকের নিচে বিপদ-ঘণ্টা বাজিয়ে যেন ছুটে চলেছে দমকল বাহিনী। বৃকটা তাব এইবার বৃষ্টি একটা জ্বলন্ত বাড়ির মতো ধসে পড়বে।

: তোমার হাতটা এভাবে ঘামছে কেন, নীলু ?

তন্দ্রাদি আঁচল দিয়ে নীলুর হাতের তালুটা মুছিয়ে দিচ্ছিল। নীলু বলে : ও কিছু না। ও রকম আমার একটু হয়ে থাকে।

নীলু হাতটা সরিয়ে নেয়। বলে : বলো, তোমার কি কথা ?

: সত্যিকথা বলবে কিন্তু—

: বলবো।

: তুমি কোনদিন কোন মেয়েমানুষের সঙ্গে শুয়েছো ?

নীলু প্রশ্নটা শুনে চমকে উঠলো : তার মানে ?

: ধরো, একটা ঘরে কোন মেয়েমানুষ নিয়ে—

নীলু গম্ভীর হয়ে যায়। বলে : হ্যাঁ, শুয়েছি। বাবা মারা যাবার পর ক’দিন মা, মীনা, মিলু আর আমি—চারজনে একসঙ্গে শুয়েছিলুম।

মাথা ছলিয়ে তন্দ্রা বলে : না। বাড়ির লোক বাদে—

নীলু একটু চিন্তা করলো। শবরীর কথা ভাবলো। বললো : হ্যাঁ, তাও শুয়েছি।

: তাকে ছুঁয়েছো ?

: ছুঁয়েছি।

: তাকে দেখেছো ভালো করে ?

: দেখেছি।

তন্দ্রাদির চোখে কয়েকবার পলক পড়লো। বোধহয় তন্দ্রাদি আর একটা প্রশ্ন করবার জগ্গে তৈরী হচ্ছে। বোধহয় এবারের প্রশ্নটা হবে সাংঘাতিক। যতই সাংঘাতিক হোক, আজ সে তন্দ্রাদির প্রশ্নের উত্তর দেবেই। তন্দ্রাদির প্রশ্ন করতে দেবী হচ্ছে। নীলু হেসে বললো : তোমার কিন্তু একটা-মাত্র প্রশ্ন করবার কথা ছিল। ছুটো প্রশ্ন করেছো। আমি ছুটোরই উত্তর দিয়েছি। এবার কিন্তু আমার প্রশ্ন—

তন্দ্রাদি ঠোঁটে রহস্যময় হাসি নিয়ে বলে : আব একটা প্রশ্ন। এইটেই শেষ।

তন্দ্রাদি বলে : তুমি তাকে—

এমন সময় বাহিরে তৃতীয় অস্তিত্বের আবির্ভাব অনুভূত হলো।

: এবার তোমার ভাত চড়াবো, বড়দিদিমণি ?

না, অণ্ড কেউ নয়—কমলা। তন্দ্রাদি তাকে উদ্দেশ্য করে বলে : একটু পরে চড়াস্ কমলা। এখনো তো বাত আটটাই বাজেনি। একটু বাদে—কেমন ?

: আচ্ছা।

কমলা চলে যায়। তন্দ্রাদি তাব প্রশ্নটা হারিয়ে ফেলেছে। কিছুতেই মনে করতে পারছে না।

নীলু বলে : এবার তাহলে আমার কথা—

: বেলো—

: আজ যদি সেদিনের সেই লাজুক ছেলেরা তোমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে আসে, তুমি তাকে কি খেলায় নেবে, তন্দ্রাদি ?

তন্দ্রাদি চোখ বড়ো বড়ো করে বলে : সেই লাজুক ছেলে তো আজ আর লাজুক নেই। সে আজ বড়ো হয়েছে, সেয়ানা হয়েছে। সে যে আজ সব জেনে বসে আছে।

নীলু মাথা নেড়ে বললো : আমার প্রশ্নের উত্তর এটা হলো না ।
আমার প্রশ্ন হলো, তুমি তাকে কি আজ খেলায় নেবে ?

: তুমি আজ বাড়ি যাও, নীলু । রাত হয়েছে । কমলা, ও
কমলা, ভাত চাপাও—

নীলু উঠে দাঁড়ালো । বৃকের ভেতরে একটা অসহ জ্বালা রি রি
করে জ্বলছে । অথচ এই অবস্থায় তন্দ্রাদি তাকে প্রায় জোর করেই
তাড়িয়ে দিচ্ছে । অথচ তন্দ্রাদি, তুমিই একদিন আমাকে বৃকে চেপে
ধরে আমার কিশোর রক্তে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলে । তুমি সেদিন
সবার অজান্তে আমার বৃকের নিচে একটা নীল আঙুন জ্বালিয়ে রেখে
দিয়েছিলে । ওকথা আমি কাউকে বলতে পারবো না । আমি জ্বলবো,
পুড়বো, মরবো । তোমাকে কোনদিনই জানাতে পারবো না ।
তোমার কাছে বলতে এলে তুমি আমাকে জোর তাড়িয়ে দেবে ।
ধেং, এই সময়টা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারলে কাজ দিত । অস্তুত
এই বৃকের জ্বালায় জ্বলতে হতো না তাকে । রাস্তার মেয়েদর দেখে
দিব্বা সময় কেটে যেত । রাস্তার স্বয়ংবর সভায় কপর্দকহীন ফেক্‌লু
সম্রাটের মতো সে পীযুষ, চন্দন, মাণ্ডুব সঙ্গে বৃকের বোতাম খুলে
দাঁড়িয়ে থাকতো ।

বাবান্দার পাশে সিঁড়ি । সিঁড়ি দিয়ে টলতে টলতে নামতে
লাগলো সে ।

: খেলার বয়েস পেরিয়ে এসেছো, নীলু । তুমিও পেরিয়ে
এসেছো, আমিও--

নীলুর মনে হলো, অনেক যুগ ধরে সে যেন এই সিঁড়ি বেয়ে
নেমেই চলেছে ; সিঁড়ি আর ফুরোয় না । কোনদিন ফুরোবেও না ।
তার এই নামারও শেষ নেই । আর ওপর থেকে দৈববাণীর মতো
তার কানে তন্দ্রাদির গলা শোনা যাচ্ছে : খেলার বয়েস পেরিয়ে
এসেছো, নীলু । তুমিও পেরিয়ে এসেছো, আমিও --



দিল্লী থেকে কোন চিঠিই এলো না। নীলু বেশ ভালোভাবেই জানতো, দিল্লীর চিঠি আসবে না। তবু মনে মনে সে আশা করেছিল, দিল্লীর সেই গাঢ় সবুজ পর্দা ঝোলানো অফিসের ফাইল ফস্কে একটা চিঠি তার নামে হয়তো উড়ে আসবে। পৃথিবীতে অনেক অপ্রত্যাশিত ঘটনাই তো ঘটে। অনেকে লটারির প্রাইজও পায়। এও তার সেই রকমের একটা প্রত্যাশা।

ভেবেছিল, দিল্লীর চাকরিটা যদি তার হয়ে যায়, তাহলে সে প্রথম বছর ছুই তিন ওখানে একা বাসায় কিংবা মেসে কাটিয়ে দেবে। মিনু পাশ করে গেলে সে মাকে নিয়ে চলে যাবে। স্বীনার ততদিনে বিয়ে-খা হয়ে যাবে। নীলু দিল্লীতেই স্থায়ী নিশ্চিন্ত সংসার পাতবে।

প্রায় দু মাস কেটে গেল। দিল্লীর সেই চিঠি এলো না। দিল্লীর সেই চিঠি না আসুক, শবরীও তো একটা চিঠি দিলে পারে। নাকি শবরীও তাকে ভুলে গেছে? রাস্তার পরিচয় রাস্তায় ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সে এখন হয়তো কলকাতায় ফিরে এসেছে। নীলুকে তার মনে পড়ার কোন কারণ নেই। মাঝে মাঝে শবরীর বাড়ি যেতে তার ইচ্ছে হয়। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হয়, শবরী হয়তো এখনো ফেরেনি। ফিরলে নিশ্চয়ই চিঠি দিত। শবরী না ফিরলে নীলুর যাওয়া ঠিক হবে না। তাহলে হয়তো সব জানাজানি হয়ে যাবে। তাছাড়া মেয়েদের কাছে গেলে তার বুকের সেই অগ্নিকাণ্ডটা আবার বেড়ে যাবে। কোন মেয়েই তাতে জ্বল ঢালবে না। সবাই সেই আগুনটাকে উস্কে দিয়ে আনন্দ পায়। কেউ ওটা নেভাবার কথা ভাবে না।

ওদের চেয়ে পীযুষ, চন্দন, মাষ্টু ঢের ভালো। ওরা পাশে থাকলে তার মনে খুব জোর থাকে, বুকের জ্বালাটাও একটা বিরাট অগ্নিকাণ্ডে কেটে পড়ে না। গ্রে স্ট্রীট থেকে শান্তি ঘোষ স্ট্রীট—সে হেঁটেই মেরে দেয়। ট্রামে-বাসে চড়ার পরসাপ লাগে না।

কিন্তু মুশ্কিল হয়েছে মাকে নিয়ে। মা তার সঙ্গে কোন কথাই বলে না। দিনরাত চুপ করে থাকে। মার এই চুপ করে থাকাটা তার কাছে অসহ্য। মার এই রাগ করার কোন মানে হয়? সে কি কখনো বলেছে, চাকরি হলেও সে কখনো চাকরি করতে যাবে না? আসলে, মা জানে না, সে কত অসহায়!

দিল্লী ছাড়া কলকাতায় এবং কলকাতার আশে-পাশে সে অনেক দরখাস্ত করেছে। কোন জবাব নেই। প্রথম প্রথম সে দরখাস্ত লেখার জন্যে মিলুর কাছ থেকে কাগজ চাইতো। তাই নিয়ে কতদিন মিলুর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। এখন ফুলস্কেপ কাগজ, লম্বা খাম, গঁদের আঠা, খবরের কাগজের কাটিং—এ সব নিয়ে বিছানার ওপর সে রীতিমতো একটা অফিস খুলে বসেছে। কিন্তু কোন জবাব নেই। সব জায়গাতেই ঝাঁপ ফেলা। মা, তুমি জানো না, এখন চাকরির দিন কাল কত খারাপ। এই পৃথিবীতে কোথাও একটু মাথা গুঁজবার ঠাই নেই, মা।

শান্তি ঘোষ স্ট্রীটে যাবার উদ্দেশ্যে জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল নীলু। এমন সময় মার ডাক এলো। না ডাকলে আজকাল বড় ভয় পায় সে। সাদা থান আর সাদা হাতে মাকে আজকাল তার বড় ভয়ঙ্কর মনে হয়। তার ওপর মার গলাটাও আজকাল ভীষণ ঠাণ্ডা বোধ হয় তার। তার মনে হয়, সে বুঝি মার কাছ থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছে। মীনা, মিলু—সবাব কাছ থেকেই। সেই তাকে অবাস্তিত উপসর্গ মনে করছে। সেও বুঝতে পারছে, এ বাড়ির সঙ্গে তারও সম্পর্কটা দিন-দিন কেমন যেন অস্পষ্ট হয়ে আসছে। এর পর সে কোনদিন হয়তো এ বাড়িতে ফিরে আসার কথাই ভুলে যাবে।

মীনা বললো : মা তোকে ডাকছে, দাদা—

: কেন?

: কি জানি?

নীলু মুখ শুকিয়ে মার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

: কোন চিঠি এলো?

: না, মা—

নীলু মার মুখের দিকে দূরের কথা, সে তার সাদা হাত ছুখানার দিকেও তাকাতে পারে না। সে জানে, এর পর মার মুখ থেকে কোন কঠিন কথা শুনতে হবে। সেজন্ম সে প্রস্তুত হয়ে থাকে। মা যাই বলুক, সে একটুও রাগ ব রবে না।

মা জিজ্ঞেস করে : ডাঃ বর্মনের কাছে আর গিয়েছিলি ?

নীলু এবার মার মুখের দিকে তাকায়। বলে : না।

: উনি তো তোকে যেতেই বলেছিলেন।

ডাঃ বর্মন নীলুকে যেতে বলেছিলেন। নীলুও তাঁর কথামতো গিয়েছিল তাঁর চেম্বারে। কিন্তু সেবারে সে ডাঃ বর্মনের এমন পরিচয় পেয়েছিল, যাতে দেখা না করেই সে চলে আসে। তাবপর সে আর ওমুখে হয়নি।

: লোকটা সুবিধের নয়, মা।

: কেন ?

নীলু মুখ নীচু করে থাকে। বলে : সে তোমাকে বলা যাবে না মা। লোকটা একেবারে যা-তা—

মা যেন আকাশ থেকে পড়লো।

: সেকি রে ? এত বড় ডাক্তার, এত তার সুনাম—

: আর বেশিদিন নয়, মা—

মা একটু কি ভাবলো। বললো : আর একবার যা। হয় হবে, না হয় নেই। একটু বুকিয়ে বলিস আমাদের কষ্টের কথা। লোকটা খারাপই যদি হয়, আমাদের তাতে কি ? তুই তো ওর কাছে চাকরি করতে যাচ্ছিস না ?

নীলু ঠিক করলো, কাল সকালেই সে আর একবার ডাঃ বর্মনের কাছে যাবে। কিন্তু এই শেষ বার।

মনে আছে, মার চিঠি নিয়ে সেই প্রথম যেদিন সে ডাঃ বর্মনের

চেয়ারে গিয়েছিল, ভবানীপুরে ডাঃ বর্মনের সেই বিখ্যাত চেয়ার খুঁজে বের করতে নীলুর একেবারেই কষ্ট হয়নি। বিরাট এয়ার-কণ্ডিশানড্ চেয়ার। বাইরে নেমপ্লেটে ডাঃ বর্মনের নাম লেখা। তার নিচে তিন লাইন জুড়ে স্বদেশী বিদেশী টাইটেল। রোগীদের জন্তে বসবার বিরাট ঘর! পাশেই পার্টিশান করে ডাঃ বর্মনের রোগী দেখার চেয়ার।

নীলু সেদিন রোগীদের পাশে একটু জায়গা করে নিয়ে বসেছিল। সবাই স্লিপ দিচ্ছে দেখে সেও একখানা স্লিপ পাঠিয়েছিল। বেলা প্রায় একটার সময় তার ডাক পড়লো। মাথার কাঁচাপাকা চুলে ডাঃ বর্মনকে পঞ্চাশের কম মনে হয় না। মুখে এক তুর্লভ প্রশান্তির ছাপ।

নীলু তাঁর হাতে মার চিঠিটা দিয়ে ভয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রথমে তো ডাঃ বর্মন নীলুকে চিনতেই পারলেন না। নীলু বাবার নাম বললো। ও, তুমি প্রশান্তুর বড় ছেলে? বি. এ. পাশ করেছে? আমি তোমাকে কি চাকরি দেবো? তিনি নীলুর সব কথা মন দিয়ে শুনলেন। বললেন : সকালে তো আমি শুধু রোগীই দেখি। বিকেলে একদিন এসো, ভেবে দেখবো কি করা যায়।

কম্পাউণ্ডারকে বললেন : নেক্সট পেশেন্টকে ডাকো—

নীলু মুখ নিচু করে বেরিয়ে এসেছিল।

কয়েকদিন পরে একদিন সন্ধ্যায় সে আবার হাজির হয়েছিল ডাঃ বর্মনের এয়ার-কণ্ডিশানড্ চেয়ারে। তখন ভিড় ছি : না। শুধু সালেয়ার-কামিজ পরা একটা মেয়ে বসে ছিল একপাশে। নীলু মেয়েটাকে দেখছিল বারে বারে। পরিপূর্ণ স্নান্য। সালোয়ার-কামিজের ওপরে শরীরের ছরস্তু ভাঁজগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট। মাথার শ্যাম্পু-করা চুল থেকে একটা মিষ্টি গন্ধ সেই রুদ্ধ ঘরের বাতাসকে ভরে দিয়েছিল। নীলু বার-তাই বেশ জোরে জোরে নিশ্বাস নিল।

ভেতর থেকে পায়ে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা একজন পেশেন্ট বেরিয়ে গেলে মেয়েটির ডাক এলো। বাঙালী নাম। মেয়েটি উঠে গেল।

: কি হয়েছে তোমার ?

এপাশ থেকে ডাঃ বর্মনের গলা স্পষ্ট শোনা যায় ।

: আমার পেটে একটা ভীষণ পেইন হয়, জ্যাঠাবাবু ।

জ্যাঠাবাবু কেন ? হয়তো কোন সম্পর্কের অজুহাত, নয় তো নিতান্তই সৌজ্ঞেয় খাতির ।

: তুমি তো রসময়ের বড় মেয়ে ?

: না, মেজো—

: রসময় এখন কোথায় ?

: নাগপুরে ।

: আচ্ছা বলো, তোমার কোথায় পেইন হয় ।

: এইখানে—

: আচ্ছা শুয়ে পড়ো, দেখি—

মেয়েটা বোধ হয় শুলো । তাই কয়েক সেকেন্ডের বিরতি ।

তারপর ডাক্তারবাবুর গলা শোনা গেল : কোথায় ? এখানে ?

: না, একটু নিচে—

: এখানে ?

: না—

: এখানে ?

: না—

তারপর শুধু 'না না না না'— একসঙ্গে অনেকগুলো 'না' ।

: আমাকে ছেড়ে দিন, জ্যাঠাবাবু । আমি বাড়ি যাবো—

নীলু উঠে দাঁড়িয়েছিল । সে স্পষ্ট শুনতে পেল, মেয়েটা কাঁদছে । চারদিকে তাকালো সে । কোথাও কেউ নেই । চারদিকে শুধু কাঠের দেয়াল । দাঁতে দাঁত ঘষলো একবার । একটা চেয়ার তুলে নিল হাতে । কাঠের দেয়ালে ছুঁড়ে মারবার জগ্গে প্রস্তুত হলো । কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে পড়লো, ডাঃ বর্মনের কাছে সে চাকরির জগ্গে এসেছে । হয়তো একটা চাকরি তিনি দিতেও পারেন । কাজেই, তাঁর ছায়-অছায়ের বিচারক সে হতে পারে না ।
অতএব—

চেয়ারটাকে নামিয়ে রেখে দরজা খুলে সে আন্তে আন্তে বেরিয়ে এলো। শপথ করলো, আর নয়। মা যতই বলুক, সে আর চাকরির উমেদারির জগ্গে ডাঃ বর্মনের চেয়ারে আসবে না। কিন্তু কোনদিন যদি সে সুযোগ পায়, সে এই লোকটাকে একবার দেখে নেবে। শালা ভূশণ্ডির কাক!

কিন্তু নীলু কথা রাখতে পারলো না। মার কথামতো আবার তাকে আসতে হলো ডাঃ বর্মনের চেয়ারে। ডাঃ বর্মন চেয়ারে ছিলেন না। কম্পাউণ্ডার বললো : 'কলে' গেছেন। একটু বাদে ফিরবেন।

নীলু বসলো। অনেকক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকতে ভালো লাগে না। সে উঠে এসে বাইরে দাঁড়ায়। দাঁড়াতে দাঁড়াতে পায়ে ব্যথা ধরে গেল। তবু দেখা নেই। ঘণ্টাখানেক পরে একসময় ডাঃ বর্মন গাড়ি থেকে নামলেন। তাঁর পেছনে পেছনে খুব কাচুমাচু মুখ করে নীলু চেয়ারে ঢুকলো।

: কি হয়েছে ?

ঘুরে দাঁড়ালেন ডাঃ বর্মন।

নীলু পরিচয় দিল।

: চিনতে পেরেছি। আগে একবার এসেছিলে, না ?

: হ্যাঁ, মার চিঠি নিয়ে—

: চাকরির ব্যাপারে, না ?

: হ্যাঁ—

নীলু একটু হাসবার চেষ্টা করে।

: এসো। দেখছি—

পাশের ঘরে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসে তিনি টেলিফোনে ডায়াল করলেন। তারপর কথা বলতে লাগলেন।

নীলু অবাক হলো, ভদ্রলোক তার বিষয়টা খুব সহানুভূতির সঙ্গে টেলিফোনের অপর প্রান্তে পৌঁছিয়ে দিলেন। ডাঃ বর্মন তাদের ফ্যামিলির প্রায় সব কথাই জানেন দেখে সে আরো অবাক

হয়ে গেল। ডাঃ বর্মন যেভাবে কথাগুলো বললেন, নীলুকে বলতে হল সে ওরকম বলতেই পারতো না। কথার শেষে উনি বললেন : ধরো; জিন্ডেস করি, ও করবে কিনা।

টেলিফোন নামিয়ে ডাঃ বর্মন জিন্ডেস করলেন : একজন এল. এস. স্টাক দরকার। করবে তুমি এল. এস. স্টাকের কাজ ?

নীলু কিছু না ভেবেচিন্তেই বলে ফেললো : করবো। মাইনে কত হবে ?

: কত আর হবে ? শ' দেড়েক টাকা।

নীলু বললো : ঠিক আছে। করবো।

ডাঃ বর্মন টেলিফোন তুলে নিলেন। বললেন : ও তাই করতে রাজী।...কি বলছেন ? কাল পাঠিয়ে দেবো ? বেশ, কাল ও যাচ্ছে। কিন্তু শোনো, ফিউচাবে কোন হায়ার পোস্ট খালি হলে একে একটা চান্স দিও।...কি বললে ? একটা চিঠি দিয়ে দেবো ? আচ্ছা বেশ, তাই দেবো।

টেলিফোন নামিয়ে রেখে ডাঃ বর্মন একটা চিঠি লিখলেন। প্যাড থেকে চিঠিখানা ছিঁড়ে ভাঁজ করে ঠিকানা লিখে নীলুর হাতে দিলেন। নীলুর তর সইছিল না। সে প্রায় ছোঁ মেরে ডাঃ বর্মনের হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে উর্ধ্ব্বাসে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো।

সিনেমার শো-ভাঙার সময়। তাই ট্রামে-বাসে বেজায় ভিড়। নীলু এই ভিড়ের বাস খুব পছন্দ করে। কারণ অধিকাংশ সময় টিকিট লাগে না। পয়সাটা পুরো বেঁচে যায়। ফুটবোর্ডের ওপর কোন রকমে একটা পা তুলে দিতে পারলেই হলো। তারপর আর কোন চিন্তা নেই। নামবার চিন্তা নামবার সময় করা যাবে।

গ্রে স্ট্রিটের মোড়ে নেমেই সে প্রায় ছুটতে শুরু করলো। কতকগুলো মেয়েকে পাশ কাটিয়ে জন-হুই লোককে ধাক্কা দিয়ে এবং কয়েকটা মুটের ঝাঁকায় ঠোকর খেয়ে গলির মুখটা ঘুরতেই তার চোখে পড়লো, ওদের দরজার সামনে একটা ট্যান্ডি দাঁড়িয়ে এবং তাকে

ঘিরে একটা ছোট-খাট জটলা। এই রকম জটলা সে তার বাবা মারা যাবার দিন দেখেছিল।

নীলুর বুকের ভেতরে রক্ত হঠাৎ শুকিয়ে যায়।

ভিড় সরিয়ে সে কাছে এসে দেখলো, কাকে যেন ওরা সবাই ট্যান্ডি থেকে ধরাধরি করে নামাচ্ছে। অন্ধকারে ভালো করে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। লাইট পোস্টের বাল্ব্‌টা পাড়ার ছেলেরা সেই কবে ইট মেরে ভেঙে দিয়েছিল, সেই থেকে আর নতুন বাল্ব্‌ ওতে লাগানো হয়নি। বাড়ির ভেতরের আলো যেটুকু রাস্তায় এসে পড়েছে, মানুষের ভিড়ে তাও আড়াল হয়ে গেছে। ছেলেটার মুখ ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। মাথার ব্যাণ্ডেজে তার বাঁ চোখটা ঢাকা পড়ে গেছে।

নীলু তার মুখের ওপর বুঁকে পড়ে। একী! এ যে মিলু! পেছনে মা কাঁদছে, মীনারও চোখে জল। নীলু এবার টেঁচিয়ে উঠলো: কে এভাবে আমার ভাইকে মেরেছে? কি দোষ করেছিল ও? তোমরা নিশ্চয়ই জানো। আমাকে দেখিয়ে দাও শুধু, আমি তাকে—

পাশেই একটি ছেলে দাঁড়িয়েছিল। বললো: এখানে বেশি চেঁচামেচি করবেন না, দাদা। বাড়ির ভেতর নিয়ে যান। একটু ধরুন, পড়ে যেতে পারে।

ছেলেটার কথায় ধরন দেখে পা পর্যন্ত তার একবার কঁপে গেল শুধু। বললো: ছেড়ে দাও তোমরা। কাউকে ধরতে হবে না। আমি একাই ওকে নিয়ে যেতে পারবো।

মিলুকে পাজাকোলা করে ভিড় ঠেলে নিয়ে এসে তার বিছানায় শুইয়ে দিল। পেছন ফিরে দেখলো, মার চোখে জল। জিজ্ঞাস করলো: ওকে নিয়ে এসেছে কারা?

: আমরা—

জনতিনেক ছেলে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে; মিলুরই সমবয়সী।

: তোমরা কে?

: আমরা মিলুর সঙ্গে পড়ি।

নীলু ভালো করে চেয়ে দেখলো, যে ছেলেটা রাস্তায় তার সঙ্গে কথা বলেছিল, সে আর ওদের সঙ্গে নেই।

: ও ছেলেটা গেল কোথায় ?

: কে বলুন তো ?

: ঐ যে রাস্তায় আমার মুখের ওপর কথা বলছিল—

: জানি না, হাসপাতাল থেকে আমাদের সঙ্গে ছিল। আমরা ভেবেছিলাম, আপনাদের কেউ হবে।

নীলু রাস্তায় নেমে গিয়েও খুঁজে এল। কোথাও তার পাত্তা নেই।

: কি হয়েছিল, বলো তো তোমরা ? মিলু কি কাউকে কিছু বলেছিল ?

একটা ছেলে এগিয়ে এসে বললো : সে পরে শুনবেন দাদা, এখন এই ওষুধগুলো আগে কিনে এনে দিন।

নীলু প্রেসক্রিপ্‌শনটা হাতে নিয়ে মার মুখের দিকে তাকালো।

: কত টাকা ?

: দাও যা হয়—

মা অনেক খোঁজাখুঁজির পর দশ টাকার একখানা নোট এনে নীলুর হাতে দিল।

: এই ছিল নিয়ে যা—

নীলু দোকানে দোকানে খুঁজে শেষে একটা দোকানে ওষুধগুলো পেল। কিন্তু দশ টাকায় হবে না। আরো বেশি লাগবে। পাঁচ টাকার মতো বাকি রেখে ওষুধগুলো নিয়ে এলো সে। আসবার সময় দোকানদার মুখখানা যথাসম্ভব বিক্রী করে বলেছিল : খাতায় টুকলাম না। দয়া করে বাকিটা মনে করে দিয়ে যাবেন।

চোখে জল আসছিল নীলুর। এখন খালি তার বাবার কথা মনে পড়ছে। এ তুমি কোথায় আমাকে ফেলে চলে গেলে, বাবা ? এখানে এতই যদি দুঃখ-যন্ত্রণা, তুমি আমাকে আগে সব

শিথিয়ে পড়িয়ে গেলে না কেন? সব সময় আড়াল করে দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের কিছুই বুঝতে দাওনি তুমি। নিজের আড়াল নিজেই ভেঙে দিয়ে চলে গেলে। আর, আমরা সবাই বানের জলে ভাসতে লাগলুম।

বুক হালকা করে একটা ভারি নিশ্বাস বেরিয়ে এলো। সেই কঁাকে আবার একটা কথা তার মনের ভেতরে ঢুকে পড়লো। সে ভেবে পাচ্ছে না, সেদিনের মিলুকে কে বা কারা এভাবে মারলো। এবং কেন মারলো? সে কী এমন অপরাধ করেছিল? যেভাবে মেরেছে, মনে হয়, মেরে ফেলাই বৃষ্টি তাদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কেন? কী এমন অপরাধ করেছিল মিলু?

মনে পড়ে, মিলু যখন সবে বই ধরেছে, তখন কী একটা বইতে ছবি দেখে মিলু বায়না ধরেছিল : দাদা, তুই ঘোড়া হ' আমি চড়বো। দিদি, আমায় চাড়য়ে দে না—

নীলুকে ঘোড়া হতে হয়েছিল। মীনা মিলুকে ধরে ওর পিঠে চড়িয়ে দিয়েছিল। মিলুর মুখে কথা আটকিয়ে যেত। আখো আখো করে বলতো : হাত্ হাত্, দলদি তলো, ধামনেওয়ালো বাগো—

তাই দেখে বাবা, মা আর মীনার সে কী হাসি!

সেই মিলুকে কারা আজ মেরেছে। এমন মেরেছে যে, মাখা কেটে গেছে। তাকাতে পারছে না চোখ মেলে। একটা চোখই ব্যাণ্ডেজে ঢাকা।

চোয়াল দুটো হঠাৎ শক্ত হয়ে ওঠে তার।

: এভাবে কতদিন পড়ে পড়ে মার খাবো আর?

এখন বুঝতে পারলো, তাদের গলির মুখে এসে পড়েছে সে। কখন চোয়াল দুটো শিথিল হয়ে ঝুলে পড়েছে, সে জানে না।

বাড়িতে ঢুকে দেখলো, ওদের ঘরে বেশ ভিড় জমে উঠেছে। খবর পেয়ে তন্দ্রাদি এসেছে, ওর সঙ্গে এসেছে ওর আরো দুই বোন। মীনাও আছে, আর আছে মিলুর তিন বন্ধু। তন্দ্রাদি বেশ জাঁকিয়ে গল্প

ছুড়ে দিয়েছে। মিলুর বন্ধুরাও বেশ উৎসাহের সঙ্গে তন্দ্রাদি আর তার বোনদের সাথে গল্প করে চলেছে। কে বলবে এটা একটা রোগীর ঘর, আধমরা অবস্থায় এ ঘরে একজন রোগী শুয়ে রয়েছে ?

মিলুর একজন বন্ধু বলছে : না দিদি, মেয়েরা স্নিম হলে দেখতে ভালো লাগে।

: মোটেই না। তন্দ্রাদির উত্তর : গায়ে একটু মাংস না থাকলে মেয়েদের দেখতে একটুও ভালো লাগে না।

মিলুব আরেক বন্ধু : না দিদি, আপনার সাথে আমি একমত হতে পারছি না, মেয়েরা হেভি হয়ে উঠলে তাদের বিউটি, চার্ম—সব গেল।

তন্দ্রাদি : তাই বলে খ্যাংরা কাঠিকে তোমরা বিশ্বসুন্দরী বলতে পারো না। গায়ে একটু মাংস না লাগলে—

তৃতীয় বন্ধু : এবারে বিশ্বসুন্দরী যে হয়েছে, সে চৌত্রিশ-চব্বিশ-চৌত্রিশ। তাকে কি আপনি খ্যাংরা কাঠি বলবেন ?

তন্দ্রাদির বোনের গলা শোনা গেল : তাকে খ্যাংরা কাঠি বলবো কেন ? তার মেজারমেন্টই তো খাঁটি।

তন্দ্রাদির আরেক বোনের গলা : ও রকম মেজারমেন্ট বাংলাদেশের ঘরে ঘরে আছে। কম্পিটিশনে যায় না তাই। নইলে হাজার হাজার বিশ্বসুন্দরী—

এবারে তন্দ্রাদির ভরাটি গলা শোনা যায় : আমি সেই কথাই তো বলছিলাম, গায়ে একটু—

নীলুর আর সহ্য হলো না। সে এতক্ষণ মার ঘরে বসেছিল। চড়া গলায় ডাকলো : মীনা—

তার গলায় রাগের ঝাঁজ স্পষ্ট। সবাই হয়তো তা বুঝেছিল। তা নইলে সবাই এভাবে চূপ করে যাবে কেন ? মীনা এসে নীলুর সামনে দাঁড়াতেই আবার তার রাগ ফেটে পড়তে চাইলো : ওদের চলে যেতে বলে দে। রুগীর ঘরে এভাবে চৌচামেচি করলে রুগীর ভালো হয় না।

মীনার আর বলার প্রয়োজন ছিল না। ওরা এমনই নীলুর কথাগুলো শুনতে পেয়েছিল। মীনা ঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই তন্দ্রাদি জিজ্ঞেস করলো : নীলু আজ এত রেগে গেছে কেনরে ?

মীনা কিছু বলার আগেই মিলুর বন্ধুদের একজন বললো : চলবে ছলু, রাত হলো, বাড়ি যাই।

মা বেরিয়ে যায়। বলে : তোরা কিছু মনে করিস্ না, বাবা। মিলুকে এ রকম দেখে ওর মাথা একেবারে ঠিক নেই।

: দেখুন মাসিমা, মিলু আমাদেরও বন্ধু। যারা মিলুকে মেরেছে, আমরাও তাদের ছাড়বো না। ঠিক বদলা নেবো। তবে কিনা দাদার এতটা না রাগলেও চলতো—

: বললুম তো, ওর মাথাটা আজ ঠিক নেই।

: ঠিক আছে মাসিমা, আমরা আসছি—

: আবার আসিস্—

: আচ্ছা।

গলিতে ওদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেলে নীলু মাকে বলে : ওষুধগুলো খাইয়ে দাও, মা—

: আমরাও তাহলে আসি, মাসীমা।

তন্দ্রাদি বোনদের নিয়ে উঠে পড়লো।

মা আর মীনা দুজনে ধরাধরি করে মিলুকে ওষুধ খাওয়াচ্ছে। তন্দ্রাদির বোনেরা রাত্তায় নেমে পড়েছে। তন্দ্রাদি নীলুর পাশ দিয়ে যাবার সময় কানের কাছে মুখ এনে বলে যায় : আজ মেজাজ এত হট কেন ?

নীলু কোন কথা না বলে দরজা বন্ধ করে দেয়। তারপর নিশ্চেষ্টে নিজের তক্তপোশে এসে বসে। মীনা আড়চোখে দাদাকে একটু দেখে নিল। না, দাদার রাগ পড়েনি। মা মিলুর বিছানার পাশে চুপচাপ বসে আছে। ঘরে ভীষণ আবছা আলো। বাল্বটাতেও অনেক ঝুল, মাকড়সার জাল।

মা নীলুর মুখের দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করলেন : ডাঃ বর্মন কি বললেন রে ?

নীলুর মুখটা সেই অস্পষ্ট আলোর উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। বললো : একটা কাজ ঠিক হয়েছে, মা। কাল থেকেই বেরুবো। ডাঃ বর্মনই টেলিফোনে সব ঠিক করে দিয়েছেন। আমার হাতে একটা চিঠিও দিয়ে দিয়েছেন—

এত ছুখের মধ্যেও মার মুখে এক টুকরো করুণ হাসি ফুটে উঠলো।

: আমি ঠাকুরকে জানিয়ে আসি—

মা উঠে গেলে মীনা নীলুর পাশে বসে বলে : সত্যি, তুই কাল থেকে অফিসে যাবি, দাদা ?

নীলু মাথা নাড়লো।

: দাদা, আমার কথাটা তোর মনে আছে তো ?

মিলু একটু গা নাড়া দিল। বললো : মা, একটু জ্বল—

নীলু উঠে গিয়ে মিলুর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললো : জানিস্ মিলু, আমার চাকরি হয়েছে। কাল থেকে আমি বেরুবো রে—

এত ব্যথার মধ্যেও মিলুর টন্টনে জ্ঞান। সে নিড় বিড় করে বলে : আমার একটা জামা, একটা প্যান্ট—সব ছিঁড়ে গেছে—

নীলু তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে : তুই সেরে ওঠ। তোকে দোকানে নিয়ে যাবো—

মা জলের গেলাস হাতে নিয়ে কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছলো।



এক মাসের ওপর হয়ে গেল, নীলু অফিসে বেরোচ্ছে। ন'টার সময় ডাল-ভাত যা হয়, ছুটো মুখে গুঁজে বেরিয়ে আসে, ফেরে সেই সঙ্গে ছ'টায়। সকালে উঠে মিলুব জগ্গে একটু ছুখ আনতে হয়, বাজার করতে হয়। তারপর বাড়ি থেকে ছুটি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অফিসের জগ্গে দৌড়-ঝাঁপ শুরু হয়ে যায় তার। অফিসে তার জগ্গে একটা টুলের বরাদ্দ আছে। কিন্তু তাতে তার বসার সময় হয় না। এ টেবিল ও টেবিল, এ অফিস ও অফিস—ছুটতে ছুটতেই টিকিনের সময় হয়ে যায়। তখন টিকিনের কোটোটা নিয়ে সে তার টুলের ওপর একটু বসে। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় মা ছ'খানা রুটি, একটু গুড় কিংবা তরকারি কোটোয় ক'ন দিয়ে দেয়। তাই সে টিকিনের সময় বসে বসে খায়। তার সঙ্গে দশ পয়সার এক ভাঁড় চা। এতে কিন্তু পেট ভরে না। অথচ এর বেশি খাওয়ারও উপায় নেই তার। খিদের জগ্গে সব সময় শরীরটা বড় ক্লান্ত মনে হয়।

এখনো পুরো মাসের মাইনে পায়নি সে। গত মাসের এগারো তারিখে 'জয়ন' করেছে সে। কাজেই, সে মাত্র কুড়ি দিনের মাইনে পেয়েছে। মিলুর ওষুধ কিনতে ওষুধের দোকানে কিছু দেনা হয়েছিল। গোয়ালার ছুখের দাম, ওষুধের দোকানের দেনা শোধ করতেই অর্ধেক টাকা চলে গিয়েছে। বাকিটা সে মার হাতে তুলে দিয়েছিল। কিন্তু কেউ জানে না, পাঁচটা টাকা সে সরিয়ে রেখেছিল তার ডায়েরির ভাঁজের ভেতর।

কদিন হলো, শবরীর কথা নীলুর খুব মনে পড়ছে। এতদিনে শবরী নিশ্চয়ই দিল্লী থেকে ফিরেছে। দিল্লীর কথা মনে পড়লেই তার মনটা খারাপ হয়ে যায়। চারটে দিন শবরীর সঙ্গে কি করে যে কেটে গিয়েছিল, ভাবতে গেলে তার বুকঃ ভেতরের সেই পুরোনো জ্বালাটা রি-রি করে জ্বলে ওঠে। একই ঘরের ভেতর পাশাপাশি

বিছানায় শুয়ে সে আর শবরী—চার-চারটে দিন। না, আর ভাবা যায় না। অনেকগুলো টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল। চাকরিটাও হয়নি। তবু দিল্লীতে সে যা পেয়েছে, তা সে জীবনেও ভুলবে না। শবরীর সেই টানা-টানা চোখ, চোখ নাচিয়ে কথা বলার ধরন—সে কি কখনো ভুলতে পারবে? আর ক্যাপ্টেন মিস্তির? হাজার চেষ্টা করেও তাঁকে কোনদিন ভোলা যাবে না। সে ভেবেছে, পুরোমাসের মাইনে পেলে একবার ক্যাপ্টেন মিস্তিরের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। সেই সঙ্গে টাকাটাও ওঁর দিয়ে আসবে সে।

রোববারের সকালে বিছানা থেকে উঠতেই তার ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু বাজার করতে হবে, মিলুর দুধ আনতে হবে। মিলুর মাথার ব্যাণ্ডেজ গত সপ্তাহে খোলা হয়েছে। এখন সে উঠে বসে পড়তে পারে। কাল থেকে সে ক্লাস করতে বেরোবে। নীলু রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে তাকে জিজ্ঞেস করে : আজ কেমন আছিস ?

মিলু সংক্ষেপে জবাব দেয় : ভালো।

তারপর নীলুর দিন শুরু হয়ে যায়।

আজ্ঞো সেইভাবে নীলুর দিন শুরু হয়েছিল। বাজারটা করে দিয়ে সে আজ এস. সি. ডি.-তে গিয়েছিল। রাস্তার আড্ডাকে তারা বলে স্ট্রীট কর্ণার ডিউটি ; ওদের কোড্‌ ল্যাংগুয়েজে এস. সি. ডি.। আজ এস. সি. ডি. থেকে ফেরবার সময় সে পীষুষের কাছ থেকে তার শার্টটা চেয়ে নিয়ে এসেছে। ক'দিন দাড়ি কামানো হয়নি। আজ একটু সময় দিয়ে সে দাড়ি কামালো। দুটো বাজতেই সে বেরিয়ে পড়লো।

মীনা তাকে এইভাবে বেরুতে দেখে জিজ্ঞেস করলো : দাদা, তুই কোথায় যাচ্ছিস রে ?

: চূপ কর। কোথাও না—

নীলুর ধমকে মীনার কৌতুহল বেড়ে যায়। জিজ্ঞেস করে : কোন্‌ বই রে, দাদা ? চাকরি পেলি, আমাকে তুই একটা বই দেখালি না, আচ্ছা ?

তন্দ্রাদি এখন রোজই প্রায় ওদের ঘরে আড্ডা দিতে আসে। ছপুনের দিকে যখন সে ঘরে থাকে না, তখন। হয়তো মিলুর বন্ধুরাও আসে। আজ বেরোবার মুখে তন্দ্রাদির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

: কি? কোন্ সিনেমায় যাওয়া হচ্ছে?

: সিনেমায় নয়, তন্দ্রাদি —

: হুঁ, কিছু বুঝি না, না?

তন্দ্রাদি সত্যিই কিছু বোঝে না। নীলু বেরিয়ে যাচ্ছিল, তন্দ্রাদি তার কানে কানে বলে : নতুন চাকরি পেয়ে আমার চাকরিটা ছেড়ে দিলে বুঝি?

বেরোবার মুখে এসব শুনে নীলুর ভালো লাগছিল না। মনে মনে শপথ করলো, আর কোনদিন সে তন্দ্রাদির ত্রেসিয়ারের ছক আটকিয়ে দেবে না।

ডায়েরির পাতা থেকে সকালেই ঠিকানাটা টুকে নিয়েছে সে। পাঁচ টাকার নোটটাও পকেটে নিতে ভোলেনি।

থ্রে স্ট্রীটের মোড়ে লাফিয়ে একটা দোতলা বাসে উঠলো। প্রচণ্ড ভিড়। পা-টা গলিয়ে দিয়ে হাত বাড়িয়ে মাথার ওপরে কাঠখানা ধরে বুলে রইলো সে। চেহারায় একটু লম্বা বলে বাসে যাওয়া-আসার খুব তার সুবিধে। কিন্তু অক্ষিসে তাই নিয়ে সকলেরই একটু কটাক্ষ। সহকর্মীরা বলে : মীলুদার চেহারাটা ঠিক এল. এস. স্টাফের মতো নয়।

এ পথে অনেকগুলো থিয়েটার আর সিনেমা হল। কলেজ স্ট্রীটের আগেই তাই বাসটা হাল্কা হয়ে এলো। চাই-কি, একটা সিটও খালি পেয়ে গেল সে। কণ্ডাক্টার এতক্ষণ টিকিট চাইতে আসেনি। আর কিছুক্ষণ কাটিয়ে দিতে পারলে পাঁচ টাকার নোটটার হাত দিতে হবে না।

এস্ট্রানেড্ আসতেই সাইডের সিটটা পেয়ে গেল সে। তারপর যা সে এতক্ষণ ভাবছিল, কণ্ডাক্টার তার নাকের ডগায় টিকিটের বাণ্ডিল দিয়ে একটা কর কর আওয়াজ করে বললো : দেখি টিকিটটা।

খুব নিবিষ্ট প্রকৃতি-প্রেমিকের মতো বাইরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসেছিল সে। চম্কে পকেট থেকে পাঁচ টাকার নোটটা বের করে কণ্ঠাকটারের সামনে এগিয়ে ধরলো।

: খুচরো দিন, ভাঙানি হবে না।

: খুচরো নেই—

: কেন যে আপনারা খুচরো নিয়ে ওঠেন না ?

: খুচরো নিয়ে সব সময় ওঠা সম্ভব হয় না।

গজ গজ করতে করতে কণ্ঠাকটার নিচে নেমে যায়।

নীলু ভাবে লোকটা নিচে নেমে গেল—নামবার সময় ঠিক ঝামেলা করবে। ঝামেলা করলে তখন দেখা যাবে। তত্ত্বক্ষণ বাসের জানলা থেকে রাস্তাটাকে সার্ভে করা যাক।

গড়িয়াহাটের মোড়ে হড়মুড় করে নেমে পড়ল সে।

ষাক্ পাঁচ টাকার নোটটায় হাত দিতে হলো না।

গড়িয়াহাটের মোড় পেরিয়ে পকেট থেকে কাগজটা বের করে ঠিকানাটা সে দেখে নিল। প্রায় মিনিট দশেক হাঁটতে হলো তাকে। তারপর ডান দিকের একটা রাস্তা। রাস্তার মুখে একটা তিনকোণা পার্ক। পার্কটাকে বাঁ দিকে রেখে হেঁটে গিয়ে ফেব বাঁদিকেব একটা রাস্তা। লোকজন নেই। এবার স্থানীয় কাউকে একটু জিজ্ঞেস করতে হয়। পকেট থেকে কাগজটা বের করে দেখলো, রাস্তাটা মিলেছে। কিন্তু নম্বরটা পাচ্ছে না। এ রাস্তার নম্বরগুলো বড় গোলমেলে। সামনের বাড়িটার নম্বর ৪৫/১। তার পাশেই ৮৩২। এ কি রকম সিরিয়াল হলো? সামনে পেছনে সে কয়েকবার হাঁটাহাঁটি করলো। কিন্তু ৭৭-এ নম্বরের বাড়িটা সে কিছুতেই খুঁজে বের করতে পারলো না। ৭৫, ৭৬ পাওয়া গেল। ৭৭-এর দেখা নেই। তবে কি শবরী তাকে ভুল নম্বর দিয়েছিল ?

ছটোয় সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। এখন বোধ হয় চারটে বাজে। আর খোঁজা বৃথা। এবার বাড়ি ফেরাই ভালো। তবে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক। একটা লোকও নেই, যাকে সে নম্বরটা কোথায় পড়তে পারে, জিজ্ঞেস করবে। এ আবার কি রকম কলকাতা? বিকেল চারটেয়ও কেউ বাড়ি থেকে বেরোয় না? একটা লোককে আসতে দেখে নীলুর মনে খুব ভরসা হলো। লোকটা তার দিকে না তাকিয়ে চলে যাচ্ছিল। নীলু জিজ্ঞেস করে : আচ্ছা, ৭৭-এ বাড়িটা কোথায় হবে বলতে পারেন?

: আমি এখানে থাকি না।

লোকটা সামনে কাকে যেন ধরবার জন্মে অব্যর্থ শিকারীর মতো ছুটে চলেছে। শিকার ফস্কাবার ভয়ে তার দিকে একবার ফিরেও তাকালো না। নীলু আরো কয়েক পা এগিয়ে গেল। দরজায় ১২৪ নম্বর এসে পড়লো। ধারে-কাছে কোথাও সেলাই কলের শব্দে তার মনে হলো, কাছাকাছি কোনখানে কলকাতা বুঝি-বা বেঁচে আছে।

সামনেই একটা দর্জির দোকান। একটা দাঁজ গলায় ফিতে ঝুলিয়ে সেলাই করছে। আর একটু দূরে দরজার পাশে টুলে একটা রুখুসুখু ছেলে বসে সিগ্রেট খাচ্ছে। সাদাটে মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথার চুলের সঙ্গে অনেকদিন চিরুনির সম্পর্ক নেই। চোখ ছটো লাল। নীলু তাকে জিজ্ঞেস করবে কি করবে না ভাবতে ভাবতে জিজ্ঞেস করেই ফেললো : আচ্ছা, ৭৭-এ নম্বরটা কোথায় হবে বলতে পারেন?

ছেলেটা তাকে দেখেই টান হয়ে উঠে দাঁড়ালো।

: সঙ্গে আসুন—

নীলু ছেলেটার পেছন পেছন কিছুদূর গেল।

: দাঁড়ান।

নীলু কিছু বুঝতে পারলো না। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলো।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ছ'সাত জন যু ক এসে তাকে ধিরে ফেললো।

: কোথায় যাওয়া হবে ?

নীলু হঠাৎ তার চার পাশে এতগুলি যুবককে ঘিরে দাঁড়াতে দেখে অবাক হয়ে গেল। প্রথমে যে ছেলেটির সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল, তার হাতে একটি ভোজালি। নীলু একটু ঘাবড়িয়ে যায়। বলে : আমি তো আগেই বলেছি, ৭৭-এ নম্বরের বাড়িতে যাবো।

একজন জিজ্ঞেস করলো : কোথায় থাকো ?

: গ্রে স্ট্রীট।

প্রথম ছেলেটি বলে : ঠিক ধরেছি, স্না পুলিশের লোক—

: গ্রে স্ট্রীটে বাড়ি হলে বুঝি পুলিশের লোক—

এবার আরেক জন দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে ওঠে : স্না, আবার মুখে মুখে তর্ক করে ছাখ—

নীলুর রক্ত ক্ষেপে ওঠে। চোখছুটো জ্বালা করছে তার। একটা বুঁবি ঝেড়ে দেবার প্রবল ইচ্ছেকে সে অভিকষ্টে সামলাতে পারলো।

: কি করা হয় ?

: চাকরি —

: কোথায় ? লালবাজারে ?

নীলু এবার হেসে ফেললো।

: সত্যি বলছি ভাই, বিশ্বাস করো, আমি পুলিশের লোক নই।

এবারে মোটাপানা একটি ছেলে, মুখে গালভর্তি দাড়ি, এগিরে এলো। বললো : তুমি কোন্ রাজনীতি করো ?

: আমি রাজনীতি-টাজনীতির ধার ধারি না।

: শাট আপ ! জানো, আমরা তোমাকে কি করতে পারি ?

নীলুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপছিল। সে বললো : আপনারা আমাকে যা খুশী তাই করতে পারেন। আমি যা করি না, আপনাদের কাছে তাই খুলে বললুম।

একটা রোগা চেহারার ছেলে এবার এগিয়ে এলো। গলাটাও মেয়েলি ধরনের। দেখলেই মনে হয়, কোন গোপন অস্থানে ভুগছে সে। [হয়তো বেশিদিন বাঁচবেও না। দেখলে কষ্ট হয়।] বললো :

এ পুলিশের লোক না হয়ে যায় না। দেখছি, না, ওর চেহারাই বলে দিচ্ছে।

নীলু তার কথার কোন জবাবই দিল না।

মোটা চেহারার ছেলেটা বললো : তোমার পকেটে কি আছে, দেখি, বের করো।

নীলু ঠিকানাটা বের করে আনলো। তার সঙ্গে পাঁচ টাকার নোটটাও বেরিয়ে এলো। পেছন থেকে সঙ্গে সঙ্গে কে নোটটা তুলে নিল। মোটাশানা ছেলেটা ঠিকানা পড়তে লাগলো : শ্যামল গাঙ্গুলি—

নীলু শুধরে দিল : শ্যামল নয়, শবরী—

: ও, পুরুষ নয়, মহিলা—

আরেকজন জিজ্ঞেস করলো : হঠাৎ মহিলাকে তোমার প্রয়োজন কেন হলো, বলতে পারো ?

নীলুর আর ওদের সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছিল না। সে সংক্ষেপে শুধু বলে : দিল্লীতে আলাপ হয়েছিল। উনি আমাকে বাড়িতে ডেকেছিলেন।

: আবার দিল্লীও যাওয়া হয়, দেখছি।

আরেকজন জিজ্ঞেস করলো : সপ্তাহে দাদা, ক'বার দিল্লী যাওয়া হয় ?

নীলু হেসে বলে : জীবনে একবারই গিয়েছিলুম। সেই শেষ—

: শ্যাকামি রাখো—

নীলু চুপ করে থাকে।

মোটাশানা ছেলেটা একটা হাত কোমরে রেখে কাগজটার দিকে চেয়ে বলে : এই-যে শবরী গাঙ্গুলি, না কি,—এ তোমাকে চিনতে পারবে তো ? নীলু বলে : আমি সেই কথাই বলতে যাচ্ছিলুম। আমাকে ওঁদের বাড়ি নিয়ে চলুন। যদি চিনতে পারেন তো ভালো, যদি চিনতে না পারেন, আপনারা আমাকে নিয়ে যা খুশী, তাই করবেন।

কাঁসির আসামীর মতো নীলুকে ওরা শবরীদের বাড়ির সামনে নিয়ে গেল। দরজার পাশে কলিং বেলের সুইচ। পাশে লেখা সি. গান্ধুলি। ওরা সুইচ টিপলো।

নীলু ভাবে, যদি শবরী দিল্লী থেকে ফিরে না থাকে, অথবা কোথাও বেরিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আজ সে শেষ হয়ে যাবে। এবং শবরী তা কোনদিনই জানতে পারবে না। তার মা, মীনা, মিলু— এদের কি হবে, কে জানে ?

ওপরের বারান্দায় এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন। নীলু চেষ্টা করে উঠলো : এই তো উনি। শবরীর কাকু—চয়নবাবু—

ভদ্রলোকের মুখের চেহারায় কোন পরিবর্তন হলো না। স্বভাবতই এতগুলো ছেলেকে দল বেঁধে দরজার কাছে দাঁড়াতে দেখে তিনি একটু বিরক্তই হয়েছিলেন। তাছাড়া, এদের চেহারায় এবং বেশবাসে এমন কিছু ছিল, যা বিরক্তিকর।

রোগা চেহারার ছেলেটি তার মেয়েলি গলায় জিজ্ঞেস করলো : এই-ষে, একে চেনেন ?

কবে ট্রেনে কয়েক মিনিটের জন্তে নীলুকে উনি দেখেছিলেন, তা কি এতদিন ঠর মনে থাকতে পারে ? তবু যদি চিনতে পারেন, নীলু হাসি-হাসি মুখ করে শবরীর চয়নকাকুর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন। না, তিনি চেনেন না।

নীলুর মাথাটা টলে গেল। তার ঘাড় হাত দিয়ে দর্জির দোকানের সেই খোঁচা-খোঁচা দাড়িওয়ালা ছেলেটা শাসিয়ে উঠলো : ব্রাক্ মারবার জায়গা পেলে না তুমি ? আমাদের চোখে ধুলো—

সঙ্গে সঙ্গে আরো গোটা-দুই ছেলে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ওপর থেকে শবরীর চয়নকাকু চেষ্টা করে উঠলেন : আরে, করছো কি তোমরা ? ছেলেটাকে মেরেই ফেলবে নাকি ?

নিচের তুমুল সোরগোলের মধ্যে ওপরের বারান্দায় শবরীর চেহারাটা ভেসে উঠলো। নীলুর কবেকার ইতিহাসে পড়া ভিক্টোরী

সংঘমিত্রা কিংবা স্নজাতার মতো মনে হলো শবরীকে। তার পাশে ১, ২, ৩—হ্যাঁ, তিনজন মহিলা এসে দাঁড়িয়েছেন।

সেই প্রচণ্ড সোরগোলের মধ্যে নীলু শবরীর গলা ঠিক শুনতে পেল। শবরী বলছে : ঐ তো নীলিম, নীলিমকে ওরা মারছে কেন ? চয়নকাকু, নীলিমকে বাঁচাও—

নীলুর কাছে শবরীর চিংকার অনেকটা কান্নার মতো শুনিয়েছিল। হঠাৎ সোরগোলটা স্তব্ধ হয়ে গেল। নীলুর গায়ের ওপর ত্রুক্ষ ধাবাগুলোও হঠাৎ শিথিল হয়ে গেল।

সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রায় দৈববাণীর মতো শবরীর গলা শোনা গেল : তোমরা নীলিমকে মারছো কেন ? কি করেছে ও ?

নীলু শবরীকে দেখিয়ে বললো : এই তো শবরী—

মোটাপানা ছেলেটা জিজ্ঞেস করলো : আপনি শবরী গান্জুলি ?

শবরী : হ্যাঁ।

: আপনি একে চেনেন ?

: হ্যাঁ।

: এ যাত্রায় খুব বেঁচে গেলেন, দাদা।

সবাই মাথা নিচু করে চলে গেল।

শবরী নিচে নেমে এসে দরজা খুলে নীলুকে ওপরে নিয়ে যায়। শবরী আজ লালচে রঙের একখানা শাড়ি পরেছে। ঠিক লাল নয়, অনেকটা গেরুয়ার কাছাকাছি। সেইজন্মে শবরীকে আজ সংঘমিত্রা বা স্নজাতার মতো মনে হচ্ছে তার।

নীলু বেশ বুঝতে পারে, টানা-হ্যাঁচড়ায় তার বেশবাস বা পোশাক-আশাক ঠিক শবরীদের বাড়ি আসার মতো নেই। চুলে একজন হাত দিয়েছিল। চুল নিশ্চয়ই উসকো হয়ে গেছে। জামার দিকে তাকালো। জামাটা পীষুধের—সে আজ সকালে তার কাছ থেকে একদিনের জন্মে চেয়ে এনেছিল। কিন্তু একী হয়েছে ? বুক পকেটটা ছিঁড়ে বুলছে একটা কুকুরের জিভের মতো। ইস, পীষুধকে সে কি বলে বোঝাবে ?

নীলুকে নিয়ে একটা ঘরে সোফার ওপর বসালো শবরী। শবরীর মতো দেখতে, তবে বয়েসে ছোট, সম্ভবত কবরীই হবে— ফুলস্পীড়ে পাখা চালিয়ে দিল। শবরী, কবরী [যদি সে কবরী হয়] এবং আর এক ভদ্রমহিলা একটু বয়স্কা—[মনে হয়, অবিবাহিতা কিংবা বিধবা] তার চারপাশে ঘিরে বসলো।

কবরী জিজ্ঞেস করলো : ওরা আপনাকে খুব মেরেছে বুঝি ?

নীলু হাসবার চেষ্টা করে। বলে : না, মারেনি। এর পর হয়তো নিয়ে যেত কোথাও ; সেইখানে—

শবরী বলে : তোমার জামাটা ওরা ছিঁড়ে দিল। আর তুমি কিছু বললে না ?

: ওরা কিছু বলার অপেক্ষা রাখে ? নীলু বললো : তোমাদের বাড়িটা খুঁজে পাচ্ছিলুম না। একজনকে জিজ্ঞেস করেছি মাত্র। তারপরই ভিমরুলের মতো আমাকে ছেকে ধরলো। হাজার প্রশ্ন। ওদের সন্দেহ, আমি নাকি পুলিশের লোক—

বয়স্কা ভদ্রমহিলা গম্ভীরভাবে বললেন : আজকাল পাড়ায় পাড়ায় এই সব হচ্ছে।

শবরী বলে : এদের সাথে তোমার পরিচয় নেই। এ হচ্ছে আমাদের রমলাদি, এ হচ্ছে—

: জানি। নীলু বলে।

: কে বলো তো ?

: কবরী।

লজ্জায় কিংবা অহংকারে কবরীর মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

: বা-রে, কি করে জানলেন আপনি ? দিদি নিশ্চয়ই বলে দিয়েছে।

: কখন বললুম ? তোদের সামনেই তো আছি।

কবরী চোখ পাকিয়ে বলে : আপনি সত্যিসত্যিই পুলিশের লোক নন তো ?

সবাই হেসে উঠলো।

হাসি থামলে শবরী বলে : এ হচ্ছে নীলিম। যার কথা একটু আগে বলছিলুম।

রমলাদি বলে উঠলেন : আর পরিচয়ের দরকার নেই। ক'দিন আপনার প্রশংসা শুনতে শুনতে কান ছুটো পচে গেল। কথায় কথায় শুধু নীলিম। এই একটু আগেই আপনার কথা বলছিল। রাস্তায় হল্পা শুনে উঠে গিয়ে দেখি—নীলিম। অনেকদিন বাঁচবেন মশাই। রাস্তার ছেলেরা আপনার কিছুই করতে পারবে না।

শবরী বলে : মোটেই না। আমি তোমাদের কাছে দিল্লী জার্নির কথা বলছিলুম। নীলিমের সঙ্গে দেখা হলো, আলাপ হলো, আমাকে নানাভাবে সে সাহায্য করলো—বলবো না সে সব কথা ?

নীলু মুখটা রুমাল দিয়ে মুছে নিয়ে বলে : শবরীর কথা আপনি একটুও বিশ্বাস করবেন না। আমি কোন সাহায্যই করিনি।

: করোনি ? শবরী প্রায় ধমক দিয়ে ওঠে : কি যেন স্টেশনটার নাম ? তুমি ওখানে জল আনতে আনতে ট্রেন ছেড়ে দেয়নি ? তুমি ছুটতে ছুটতে এসে ট্রেনে ওঠোনি ?

নীলু বলে : ওটা যদি সাহায্য হয়, ও রকম সাহায্য সবাই করে থাকে।

শবরী থামতে চায় না। বলে চলে : তারপর দিল্লীর যা হালচাল, ওখানে ঠিকানা খুঁজে বের করা খুব ঈজি ব্যাপার নয়। নীলিম সঙ্গে গিয়ে আমাকে অচিনমামার কোয়ার্টারে পৌঁছিয়ে দিলে। তবে ছুটি পেয়েছে।

শবরী নীলিমের চোখে একবার তাকালো। বললো : তোমাকে আজ খুব টায়ার্ড লাগছে। একটু জল খাবে, নীলিম ?

: চোখে-মুখে একটু জল দেওয়া দরকার। তোমাদের বাথরুমটা একটু দেখিয়ে দাও—

: এসো আমার সঙ্গে—

বাথরুমে যেতে যেতে শবরী বলে : আমি যেভাবে বললুম, এইভাবে কিন্তু। এর বাইরে বেশি বলো না, কেমন ?

বাথরুমে আয়না-চিরুনি ছিল।

চোখে-মুখে জল দিয়ে চুল ঝাঁচড়িয়ে ফিটফাট হয়ে এসে নীলু বললো।

শবরী ভেতরে গিয়ে মাকে টানতে টানতে নিয়ে এলো : নীলিম,
এই আমার মা।

নীলু উঠে দাঁড়িয়ে বললো : নমস্কার—

সঙ্গে সঙ্গে শবরী ধমক দিয়ে ওঠে : নমস্কার কি ? পায়ে
হাত দিয়ে প্রণাম করো।

মা শবরীকে বকলেন : যাঃ, ভদ্রলোককে এভাবে কেউ বলে
নাকি !

লজ্জা পেয়ে নীলু আন্তে আন্তে ওঁর দিকে এগোয়।

শবরী তাকে মনে করিয়ে দেয় : জানো, আমরা ব্রাহ্মণ—

নীলু মুখ করুণ করে বলে : কিন্তু আমরা যে ক্রিষ্টিয়ান্—

: তাহলে আমাকে প্রণাম করতে হবে না বাবা—

শবরীর মা ছুঁপা পিছিয়ে গেলেন। তবু নীলুকেন্ এগিয়ে আসতে
দেখে ওঁর মুখখানা শুকিয়ে আসছে। নীলু কোন দিকে ক্রঙ্কেপ না
করে শবরীর মার পা ছুঁয়ে প্রণাম করলো।

শবরী মাকে আশ্বস্ত করবার জন্তে বলে : না গো মা, ও ক্রিষ্টিয়ান্
নয়।

নীলু জোর দিয়ে বলে : হ্যাঁ মাসীমা, আমি ক্রিষ্টিয়ান্। এই
দেখুন—

জামার ভেতর থেকে ক্রশশুদ্ধ একটা চেইন বের করে সে দেখায়।

: না মা, তুমি ওর কথা একদম বিশ্বাস করো না। ও ভীষণ
মিথ্যাবাদী। ও রকম ক্রশ আজকাল প্রায় সব ছেলেরাই পরে
রাস্তায় বেরোয়।

নীলু বলে : আপনি আশ্বন। বশ্বন মাসীমা। মিথ্যাবাদী হই
আর ষাই হই, সেদিন আপনার হাতের লুচি আর আলুর দমের
আন্দেকের বেশি আমিই খতম করেছিলুম।

নীলু দেখলো ভঙ্গমহিলা ভীষণ বিব্রত বোধ করছেন। তখন সে বলে : না মাসীমা, আমরা ব্যানার্জী ব্রাহ্মণ। নিশ্চিন্তে রান্নাঘরে যেতে পারেন।

সবাই শব্দ করে হেসে ওঠে একসঙ্গে।

মাসীমা বলেন : হ্যাঁ, তোমার কথা শবরী দিল্লী থেকে ফিরে এসে অন্ধি বলছে।

শবরী বলে : তোমরা বসো। আমি চয়নকাকুকে ডেকে আনি।

শবরী উঠে গিয়ে চয়নকাকুকে ডেকে নিয়ে এলো। চয়নকাকু সোফায় বসতে বসতে বললেন : তুমি তো বড় সাংঘাতিক ছেলে হে ? হাওড়া স্টেশনে ট্রেনে তোমাকে যখন দেখি, তখন মনে হলো এক অ্যাংরি ইয়ংম্যান। শবরীকে তুলে দিয়ে আসবার সময় সারাপথ, এমন-কি রাস্তিরেও ভেবেছি, শবরীব জানিটা ভালো হবে না। এমন ব্যাড কম্পানীতে জার্নি কখনো ভালো হতে পারে না। কিন্তু শবরী দিল্লী থেকে চিঠি লিখলো, ভীষণ ভালো ছেলে। চাকরির জন্মে ইন্টারভিউ দিতে এসেছিল। সারাপথ ভীষণ ফ্রেণ্ডলি বিহেবিয়ার করেছে। দিল্লীতে অচিনমামার বাড়িতে পেরিয়ে দিয়ে গিয়েছে। নট ওন্লি দ্যাট্, রেড ফোর্টে বেড়াতে গিয়ে কোন্ এক ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। যাই হোক, আমি তোমাকে দেখে, ভাই, বুঝতে পারিনি। তুমি খুব দায়িত্ববান ছেলে—ভেরি রেস্পনসিব্‌ল।

শবরী বলে : আব প্রশংসা করো না, কাকু। দেখ হা না, বেচারী প্রশংসায় একেবারে গলে গলে পড়ছে।

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলেন। হাসি খামলে নীলু খুব ভরাটি গলায় বলে : দেখুন, কিছু না থাক, বাঙালী ছেলেদের অন্তত এই গুণটুকু এখনো আছে—কলকাতা এখনো—

সঙ্গে সঙ্গে চয়নকাকু বলে উঠলেন : যার নয়না তুমি একটু আগে পেলো। বোধ হয় একটু হাড়ে হাড়েই পেয়েছো—

আবার সবাই হেসে উঠলেন।

: ভাগ্যিস, শবরী দেখতে পেয়েছিল। নইলে ভাবো দেখিনি,

তোমার বাঙালী-প্রীতি আর ঐ কলকাতা-প্রীতি তোমাকে কতদূরে নিয়ে যেতো—

নীলু প্রসঙ্গটা এবারে চয়নকাকুর উপর নিয়ে ফেলবার জন্তে বলে : আমি ভেবেছিলুম আপনি হয়তো আমাকে চিনতে পারবেন।

: আমি তোমাকে ট্রেনে সেই মিনিট ছুয়েকের জন্তে দেখে-ছিলুম। সত্যি ভাই, চিনতে পারিনি।

: আমি কিন্তু আপনাকে চিনতে পেরেছিলুম।

: তোমাদের চোখ আর আমার চোখ—

শবরীর মা বললেন : আমি একটু আসছি। তোমরা গল্প করো।

নীলু বলে : স্নান করতে হবে না, মাসীমা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

: স্নান কেন ?

চয়নকাকুর প্রশ্ন।

উত্তর দিল কবরী। বললো : মার পায়ে হাত দিয়ে প্রশংসা করে উনি বলেছেন যে, উনি ক্রিষ্টিয়ান্। আবার গলা থেকে ক্রেশ বের করে দেখিয়েছেন—

: অর্থাৎ ক্রিষ্টিয়ানের পৈতে—

একটু থেমে বললেন : বললেই যখন, ক্রিষ্টিয়ান্ বললে কেন ? মুসলমান বললেই তো পারতে—

একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি।

: একশো বছর আগেকার কুসংস্কার সব।

ঘরের চেহারা হঠাৎ পাল্টে গেল। সবাই তা বুঝতে পারলো। চয়নকাকু বুঝতে পেরেছিলেন। তাই হেসে বললেন : বোলা, তোমাদের সেই ক্যাপ্‌টেনের কথা বোলা। সে নেতাজীর পা জড়িয়ে ধরে কী বলেছিল ?

নীলু হেসে বললো : সে এক আশ্চর্য মানুষ। ওঁর কথা শুনে বিশ্বাস হবে না, আবার অবিশ্বাস করাও যাবে না। আমার ইচ্ছে আছে, একবার ওর সঙ্গে দেখা করবো।

শবরী বললো : যেদিন যাবে আমাকে নিয়ে যেও কিন্তু—

কবরী বলে : আমিও যাবো কিন্তু তোমাদের সঙ্গে ।

চয়নকাকু গম্ভীরভাবে বললেন : আমিও যাবো নাকি ভাবছি—

ওঁর বলার ভঙ্গিতে সবাই হেসে উঠলো ।

রমলাদি এতক্ষণ বসে সমস্ত উপভোগ করছিলেন । বললেন :
আমিই বা বাদ পড়ে যাই কেন ?

চয়নকাকু বললেন : আমি যাবো অগ্র উদ্দেশ্যে ।

সবাই ওঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন ।

: আমি শুধু ওঁকে একটু ছুঁয়ে আসবো ।

রমলাদি হা-হা করে হেসে উঠলেন ।

: উনি নেতাজীকে ছুঁয়েছিলেন । কাজেই, ওঁকে ছুঁলে আমার
নেতাজীকে ছোঁওয়া হয়ে যাবে । তখন সবাইকে বলতে পারবো,
আমি নেতাজীকে ছুঁয়েছি—আর তখন হয়তো আমাকে একটু ছোঁবার
জগ্রে ভীষণ হলুস্থলু পড়ে যাবে । আচ্ছা, তোমরা কথা বলো ।
আমি একটা বই পড়ছি, শেষ করি—

হাসতে হাসতে উনি বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে ।

সত্যি, উনি খুব মজার মানুষ । রসিক এবং সপ্রতিভ ।

নীলু ঘরের চারদিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল । শবরীর বাবার
ছবি, শবরী আর কবরীর ছোটবেলার ছবি, মার কোলে
শবরীর দেড় বছর বয়সের ছবি আর কবরীর ঝাঁকা তিনখানা
অয়েল পেন্টিং । শবরীর শৈশবের ছবিগুলোর প্রতি নীলুর অধিক
মনোযোগ দেখে শবরী বলে : থাক, ওগুলো আর নাই-বা
দেখলে—

নীলু তার কথায় কান না দিয়ে আরো গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে
দেখতে লাগলো ।

শবরী বলে : ছেলেবেলায় সবাইকে দেখতে ঐ রকমই হয় ।

: তাই নাকি ?

: ঐ তিনখানা অয়েল পেন্টিং কবরীর ঝাঁকা—

নীলু ছবি ভিনখানা দেখে। ফলওয়ালী, কম্পোজিশন আর খেয়ামারি। শব্দী বলে : ভিনখানার মধ্যে কোন্টা ভোনার ভালো লেগেছে, বলতে হবে।

এমন সময় রান্নাঘর থেকে মার ডাক এলো : কবরী, একটু এদিকে আয়—

নীলু ছবি বোঝে না। সে বোঝে কোন সিন-সিনারি কিংবা বড় জোর রবীন্দ্রনাথের ছবির স্কেচ। সে এসব মডার্ন আর্টের কিছু বোঝে না। শব্দী বলে : আমি জানি, তুমি ঐ ‘ফলওয়ালী’ ছবিটাই ভালো লেগেছে বলবে।

ফলওয়ালীর শরীরের বিশেষ প্রত্যঙ্গের প্রতি শিল্পীর আসক্তি এখন নীলুর চোখে পড়লো। সামনের ঝুড়িতে রাখা ফলগুলির সঙ্গে শরীরের সেই বিশেষ অংশটির একটা গভীর সাদৃশ্য শিল্পী রেখেছে।

কবরী লুচি আলুর দম নিয়ে চুকলে শব্দী বললো : নীলিম কিন্তু তোর ‘ফলওয়ালী’ ছবিটাকেই বেস্ট বলেছে।

কবরী হেসে বললো : মৃদয়দারই দল ভারি হচ্ছে।

হঠাৎ রমলাদি জিজ্ঞেস করে বসে : আচ্ছা শব্দী, মৃদয় এর মধ্যে এসেছিল ?

জবাব দিল কবরী। সে বলে : আসবে না আবার !

শব্দীর মুখের দিকে তাকিয়ে কবরী খেমে যায়।

নীলু অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছে, শব্দীর রমলাদি বিশেষ কথাবার্তা বলছে না। মাঝে-মাঝে খাপছাড়া ছ’একটা কথা ছাড়া সে মুখ খোলেনি। গোড়ার দিকে সে আজ তাকে ছ’একটা কথা বলতে শুনেছিল, চয়নকাকুর কথায় তাকে হাসতে দেখেছে। তারপর চয়নকাকু চলে যাবার পর থেকে সে চূপচাপ।

নীলু খাওয়ার কাঁকে কাঁকে রমলাদির মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। স্নো-পাউডারের স্পর্শ তাতে নেই। তার ফর্সা নিটোল মুখে একটা শাস্ত কমনীয়তার ছাপ আছে। সে জন্তে রমলাদির মুখে বয়েসের অতিরিক্ত একটা সৌন্দর্য সহজেই চোখে পড়ে।

শবরী ও রমলাদি—অসমবয়সী এই মেয়ে দুটির মধ্যে সম্পর্ক কি, নীলু খুঁজে পায় না।

শবরী রমলাদির পেছনে দাঁড়িয়ে তার মাথার খোলা চুলগুলো নিয়ে বিছুনি করে দিচ্ছিল। কবরী তার দিকে তাকিয়ে দেখছিল মন দিয়ে। রমলাদির চুলের গোছা হাতে নিয়ে শবরী তাকে বললো : রমলাদির চুলের গোছ ঝাঙ্, হাতে ধরা যাচ্ছে না। যেমনি কালো, তেমনি লম্বা। নীলিম আবার কাব্যি করে বলবে—‘চুল তার কবেকার’—

রমলাদি বললো : থাক, আর রমলাদিকে নিয়ে কেন, ভাই ?

: জানো নীলিম, রমলাদি খুব ভাল মেয়ে। এ বছর ক’টা সাবজেক্টে ডিস্টিন্শন মার্ক পায় দেখে নিও।

রমলাদি ধমক দিল।

নীলু ক্রুদ্ধ করে : তাহলে খাওয়াচ্ছেন তো ?

রমলাদি বলেন : কেন ?

: আপনার রেজাল্টের জগ্গে—

রমলাদির ঝক্‌ঝকে দাঁতের ওপর দিয়ে একটি করুণ হাসি ভেসে যায়। বলে : শিঙ্‌ ভেঙে শেষে—

: শিঙ্‌ ভেঙে কেন ?

: এই বয়সে শবরীদের সঙ্গে পবীন্দ্রা দিয়েছি। শিঙ্‌ ভেঙে নয় ?

শবরী রমলাদির সামনে ঘুরে দাঁড়ায়। বলে : তুমি এমনভাবে বলছো যেন, তোমার কত-না-কত বয়েস !

: নয় ? তোমার চেয়ে অস্তুত—

: থাক।

নীলু বলে : কিন্তু রমলাদি, আপনাকে কিন্তু আমাদের চেয়ে খুব বড় মনে হয় না।

: হয় না ? সেকি ? আমি তোমাদের চেয়ে অনেক বড়।

হেসে বলে : তোমাদের গুরুজন। একটু শ্রদ্ধা-ভক্তি নিয়ে কথা বলবে, বুঝলে নীলিম—

কবরী বলে : আপনি একটু গভীর থাকেন বলে আপনাকে দেখে একটু ভয় করে। ভাছাড়া আপনি তো—

: থাম্ তুই।

বলে রমলাদি হাতের প্লেট নিয়ে উঠে দাঁড়ালো : আমি মাসীমার কাছ থেকে ছুখানা লুচি চেয়ে নিয়ে আসি—

কবরী বলে : আমি এনে দিচ্ছি, রমলাদি—

রমলাদি তাকে ধমক দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। প্লেটটা রেখে ফিরে এসে বললেন : তোমার লুচি লাগবে, নীলিম ?

নীলু গেলাসটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বলে : না রমলাদি—

: হ্যাঁ, এই রকম ভক্তি-শ্রদ্ধা নিয়ে কথা বলবে।

সবাই হেসে উঠলো।

আর্টটা বাজতেই নীলু বলে উঠলো : এবার আমাকে ফিরতে হবে।

শবরী বলে : তোমাকে তো এগিয়ে দেওয়া দরকার। আসবার সময় যা হয়েছে—

: ভয় নেই, ফিরবার সময় আর কিছু হবে না।

শবরী তার মা আর চয়নকাকুকে ডেকে আনলো। চয়নকাকু জিজ্ঞেস করলেন : একা যেতে পারবে তো ?

রমলাদি বললো : আমি তো আছি।

চয়নকাকু হাসতে হাসতে বললেন : সেই ভালো। ওকে একটু গার্ড দিয়ে নিয়ে যাও।

: যা ছেলেমানুষ !

রমলাদি ফিরে সবাইকে বলে গেল : আসছি—

শবরীর মা বললেন : নীলিম, আবার এসো।

রাস্তায় এসে রমলাদি একটা খালি ট্যান্ডি পেয়ে তাকে থামালো। ট্যান্ডিতে উঠে বসে নীলুকে উঠে আসতে বললো। নীলু একপাশে

শুটিমুটি হয়ে বসলো। রমলাদি বললো : এভাবে বসলে কেন ?
ভালোভাবে বসো।

ট্যান্সিটা ট্রাম-লাইনে এসে পড়লে রমলাদি জিজ্ঞেস করলো :
তুমি কোথায় যাবে বলো তো, নীলিম !

: গ্রে স্ট্রীট।

: তাহলে হলো না।

: কি হলো না ?

: ভেবেছিলুম, তোমাকে তোমার বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে
আসবো।

: না না, তার প্রয়োজন হবে না।

রমলাদি একটু হাসলেন। হাসলে রমলাদিকে কেমন একটু
দেবী-দেবীর মতো মনে হয়। তখন রমলাদিকে কেমন যেন তার
একটু ভয় করে।

: কেন ? আমাকে তোমার বাড়ি নিয়ে যেতে আপত্তি বুঝি ?

: না না, আপত্তি হবে কেন ? আপনি তাহলে আজই চলুন—

রমলাদির দৃষ্টি সামনেব বাস্তা ধবে অকেকদূর চলে গেছে।

বলে : আর একদিন যাবো। এখন তোমাকে হাজারাব মোড়ে
নামিয়ে দিয়ে গেলে হবে না ?

হাজারাব মোড়ে ট্যান্সি থামতেই নীলু নেমে পড়লো। রমলাদি
মুখ বের করে জিজ্ঞেস করলেন : আবার কবে দেখা হচ্ছে ?

: আপনাব ঠিকানাটা তো দিলেন না !

: দরকার নেই। সামনেব শনিবার আড়াইটিব সময় মেট্রোব
সামনে থাকতে পারবে ?

: থাকবো—

: তাহলেই দেখা হবে।

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলো, এখন সে কোন্‌দিকে যাবে।

নীলু শুনলো : নিউ আলিপুর—

ট্যান্সি চলে গেলে নীলু মোড়টা ঘুরে বাসের স্টপেজে দাঁড়ালো।

কতক্ষণ পরে একটা ডবল ডেকার গজরাতে গজরাতে এসে দাঁড়ালে নীলু ফুটবোর্ডের ওপর একটা পা তুলে দিয়ে ওপরের ছাণ্ডেল ধরে বুলে রইলো। তারপর এক সময় পেছনের ভিড়ের চাপে সে আপনাতথেকেই এক-একটা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে পৌঁছে গেল।

সিট খালি ছিল না। দাঁড়াতেও কষ্ট হচ্ছিল তার। মাথায় ছাতটা ঠেকে যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের কাছে এক ভদ্রলোক ও এক ভদ্রমহিলা নেমে গেলে একটা পুরো সিট খালি হয়ে গেল। নীলু তাতে একপাশে জাঁকিয়ে বসলো। এখন নিজেকে তার ভীষণ ক্লান্ত মনে হচ্ছে। বাড়ি গিয়ে কিছু খাওয়া হোক বা না হোক, সে একটু ঘুমোতে পেলেই বেঁচে যাবে। ঠাণ্ডা বাতাসে তার চোখছটো বৃক্ষে আসছিল। এমন সময় কণাক্টার এসে তার কানের পাশে টিকিটের বাণ্ডিলের শব্দ করলো। উঠে দাঁড়িয়ে সে প্যাণ্টের পকেটে হাত ডুবিয়ে হঠাৎ বোবা হয়ে গেল। মনে পড়লো, বিকেলে ঠিকানা বের করতে গিয়ে নোটটা বেরিয়ে এলে কে একজন ওটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়েছিল। না, আর সে ওটা ফেরত দেয়নি।

●
মাঝপথে নীলুকে বাস থেকে নেমে আসতে হয়েছিল।

কণ্ডাক্টার ঘণ্টা দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে একটা খিস্তি মারায় মাথার রগছটো তার দপ্ করে জলে উঠেছিল। হাতের কাছে একখানা পাথর পেলে সে প্রাণপণে ছুঁড়ে মারতো বাসটার দিকে। দাঁতে দাঁত ঘষলো সে একবার। তারপব তার চোখে জল এসে পড়লো। আবাব এতখানি পথ হাঁটতে হবে!

ক্লান্তিতে পা চলছে না তার। তবু সে কোন কণ্ডাক্টারের দয়াপ্রার্থী হয়ে বিনেপয়সায় বাসে উঠবে না, হেঁটেই যাবে। কিন্তু ভয় হয় তার, আবার যদি কোন দলের হাতে পড়তে হয় তাকে? তবে ভরসা এই, এটা চিত্তরঞ্জন এভিনিউ—বড় রাস্তা।

যেতে যেতে নীলু থমকে দাঁড়ায়। সামনে ফুটপাথের ওপর একটা ছোটখাট জটলা। নীলু ফুটপাথ বদল করবে নাকি ভাবলো। তারপব কি ভেবে সে সোজাই হেঁটে চললো। কিন্তু জটলার কাছে এসে সে কি করবে, ভেবে পেল না। এখানেও তারই বয়সী একটা ছেলেকে নিয়ে টানা-হাঁচড়া চলেছে। চেয়ে দেখলো, সামনেই একটা বার—মদের দোকান। ছেলেট. মাতাল অবস্থায় টলতে টলতে জোর করে দোকানে উঠতে চেষ্টা করছে, আর দোকানের জন-হুই কর্মচারী তাকে জামার কলার ধরে জোর করে নামিয়ে আনছে। দোকানের দরজার কাছে কোমরে হাত দিয়ে আন্দির পাঞ্জাবী গায়ে দাঁড়িয়ে আছে কুচকুচে কালো মোটা একটা লোক। মোটা গৌফ-জোড়ায় এবং লাল চোখে নীলু ঠাউরে নিলো, ওই দোকানের মালিক।

নীলুর অনুমানই ঠিক। লোকটা সবাইকে বলছে, ছেলেটা প্রচুর মদ খেয়ে বারের ভেতরে বমি করছে। এখন জিদ ধবেছে,

সে, আরো খাবে। এদিকে ট্যাঁকে নেই পয়সা। মাল দেওয়া হয়নি বলে দোকানের একটা কর্মচারীকে ও ঘুঁষি মেরেছে। এখন জোর করে বের করে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

লোকটা বলছিল : আরে মশাই, মাল বিক্রি করার জন্তেই তো বার খুলে বসেছি। ট্যাঁকে নেই মাল খাওয়ার পয়সা, পেটে নেই হজম করার শক্তি। বলছে, আরো খাবো—

ভিড়ের ভেতর থেকে কে একজন টিপ্পনী কাটলো : দাও ওকে ধরে ওর ওগ্ৰানো মালগুলো গিলিয়ে—

নীলু একটু এগিয়ে এসে ছেলেটাকে ভালো করে দেখলো। খুব চেনা মুখ মনে হচ্ছে। কিন্তু কোথায় যে ওকে দেখেছে, কিছুতেই মনে করতে পারলো না।

হা রে কলকাতা !

আর দাঁড়িয়ে না থেকে সে হাঁটতে শুরু করলো। কিছুদূর গিয়ে সে দূরে পর পর কয়েকটা বোমা ফাটার আওয়াজ শুনতে পেল। একা হাঁটতে ভয় করছিলো তার। এখন তো সবে রাত ন'টা। আগে কতবার সে, পীষু, চন্দন, মাটু লুকিয়ে নাইট শো-য় সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরে এসেছে। কখনো এমন আওয়াজ শোনেনি। এমন ভয়ও পায়নি। রাতের কথা বাদই দিল সে, আজ বিকেল চারটের সময় শবরীদের পাড়ায় তার যে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা সে জীবনেও ভুলতে পারবে না। ইস, দেখতে দেখতে কলকাতা কেমন যেন হয়ে গেল। অথচ এই কলকাতায় তাকে সারাজীবন থাকতে হবে। মা, মীনা, মিলুকে নিয়ে বাঁচতে হবে।

কিছুদূর গিয়ে সে মনে মনে বললো : না, এ রকম বেশিদিন চলতে পারে না। দিন-বদল হবেই। এই কলকাতায় 'রায়টু'ও তো হয়েছে, আবার বন্ধও হয়ে গেছে। এও তেমনি বন্ধ হয়ে যাবে—

নীলু যখন বাড়ি পৌঁছলো, তখন রাত দশটা। স্পষ্টতই, তখন তার চোখে-মুখে সারাদিনের ক্লান্তির ছাপ।

মীনা দোর খুলে তাকে ঐ অবস্থায় দেখে চমকে উঠলো : তোকে আবার কে মারলো রে, দাদা ?

নীলু তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে যে, তাকে কেউ মারেনি। বাসে তার পকেটমার হয়ে গেছে। পয়সা-কড়ি যা ছিল, সব কেড়ে নিয়েছে। তাই হেঁটে বাড়ি ফিরতে হলো তাকে।

নীলু উঁকি মেরে দেখলো, তার ঘরে আলো নেভানো। মিলু মশারি ফেলে ঘুমিয়ে পড়েছে।

মা তার ঘরে বাসে সেলাই করছিল। হঠাৎ মেশিনের শব্দ বন্ধ হয়ে গেল।

: কি হয়েছে রে, মীনা ?

জামা খুলতে খুলতে নীলু বললো : কিছু হয়নি, মা।

দরজার কাছে গিয়ে মার দিকে জামাটা ছুঁড়ে দিয়ে সে বললো : জামার পকেটটা ছিঁড়ে গেছে—একটু সেলাই করে দিও তো, মা।

মার পাশে কতকগুলো জামার ছিট আর কাপড়ের টুকরো পড়ে ছিল। একটা জামা—সম্ভবত ব্লাউজই হবে—সেলাই কলের মুখে পড়ে। নীলুর কপালে কতকগুলো ভাঁজ পড়লো।

: জামাগুলো কার, মা ?

মা নীলুর জামার পকেটটা সিন্ধে করতে করতে বলে : পাশের বাড়ির—

নীলু আর ওখানে দাঁড়ালো না। সোজা বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করলো।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে নীলু দেখলো, মা তার জামার পকেটটা সেলাই করছে, আর মীনা রান্নাঘরে তার খাবার দিয়ে বাসে আছে। নীলু কোন কথা না বলে খেতে বাসে গেল। খাবার মানে তো শুকনো কয়েকটা রুটি, আর খানিকটা আলুর তরকারি।

মীনাও খাচ্ছিল দাদার সামনে বাসে। খেতে খেতে বললো : দাদা, আমাদের সামনের বাসে চারটে টাকা দিবি ?

৫ কেন ? কি করবি তুই ?

: একটা জামার ছিট কিনবো। জামা নেই—

নীলু মীনার কোন আব্দারই পূরণ করতে পারেনি। মনে মনে ঠিক করলো, এবারে মাইনে পেলে সে মীনাকে চারটে টাকা দেবে তার জামার ছিটের জগ্গে।

বললো : যেদিন মাইনে পাবো, চেয়ে নিস্—

মুখ ধুয়ে শুতে গেল সে। আজ ভীষণ ঘুম পাচ্ছে তার। দরজা বন্ধ করে সে শুয়ে পড়লো। এখন তার সারাদিনের ঘটনাগুলো এলোমেলোভাবে মনে পড়ছে। শবরী, কবরী, রমলাদি, শবরীর মা, চয়নকাকু, ওদের পাড়ার ছেলেগুলো, মদের দোকানের মালিক, বাসের কণ্ডাক্টর—এক-একটা মুখ সরে সরে গেল। তারপর মার সেলাই কলের শব্দ শুনতে শুনতে সে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, জানে না। মাঝরাতে ঘুম ভাঙলে সে শুনতে পেল, তখনও মার সেলাই কলের ছুঁচ সমানে শব্দ করে ছুটে চলেছে।

সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনে পড়লো, আজ শনিবার। বেলা আড়াইটার সময় তাকে মেট্রোর নিচে দাঁড়াতে হবে। রমলাদি বলেছে, ওখানে সে আজ আসবে। মনে পড়লো, ধীর শাস্ত রমলাদির মুখে কেমন একটা দেবী-দেবী ভাব। তাকে ভয় হয়, কিন্তু তার কথা এড়ানো যায় না। অথচ কেমন-যেন অসহায় বোধ হয় নিজেকে।

রমলাদিকে কিছুতেই শবরীর সাথে মেলানো যায় না। অথচ হুজনের গভীর বন্ধু। নীলু এই অসম সম্পর্কের রহস্যভেদ করে উঠতে পারে না। আবার কবরী যদিও শবরীর ছোট বোন, সেও শবরীর চেয়ে অনেক ধীর-স্থির। শবরী যেন একটু স্বতন্ত্র। শবরীর সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে ?

কিন্তু সেদিনের ঘটনার পর তার আর শবরীদের বাড়ি যেতে ইচ্ছে করে না। সেদিনের কথা মনে পড়লেই তার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

চা খেয়ে ব্যাগ হাতে সে বাজারে যায়। বাজার থেকে ফিরে দাড়ি কামাতে বসে। দাড়ি কামাতে কামাতে তার শবরীর কথা মনে পড়ে। ইস, শবরী শাস্তি ঘোষ স্ট্রীটের মোড়ে একবার আসতে পারে না? তার তো এদিকে নাকি বন্ধুর বাড়ি—পুরোনো পাড়া। মাঝে-মধ্যে এদিকে এলেই তো তার সাথে দেখা হয়ে যায়। আজকাল আবার কাজের চাপে সকাল-সন্ধ্যায় আড্ডায় যাওয়া হয়ে ওঠে না তার। সকালে বাজার সেরেই তাকে স্নানের জগ্গে তৈরী হতে হয়। বিকেলে ছ'টা-সাতটায় ফিরে বেরোতে বেরোতে আটটা বেজে যায়। ওখানে পৌছোতে-পৌছোতে সাড়ে আটটা-নটা। তখন সবাই যে-যার বাড়ি ফিরে গেছে কিংবা ফিরবার পথে। তখন ভাঙা আড্ডা আর জমতে চায় না! কত সুন্দর-সুন্দর মেয়ে রাস্তা দিয়ে চলে গেছে, সবাই দেখলো, শুধু সে-ই দেখতে পেলো না!

তাই তার মনের চারপাশে আর কোন মেয়েমানুষ আজকাল আসে না। কেবল শবরী, কবরী, রমলাদি আর তন্দ্ৰাদি।

কে জানে হয়তো শবরী এসে রোজ শাস্তি ঘোষ স্ট্রীটের মোড় দিয়ে তার বন্ধুর বাড়ি যায়। চন্দন, পীষু, মাণ্ডু—এরা সবাই তাকে দেখেছে। সে-ই শুধু দেখতে পেল না—তার অফিসের চাকরির জগ্গে। চাকরিটা এমন হয়েছে একটু দম ফেলবার সময় পায় না সে। নতুন বলে তার ওপর কাজের পর কাজের পাহাড় চাপিয়ে দিচ্ছে সবাই। আবার এল. এস. স্টাফ বলে সবাই ইচ্ছেমতো খাটিয়ে নিতে চায় তাকে।

এরই মধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। কিন্তু সে জানে, তাকে আরো অনেক দিন এই বোঝা টানতে হবে। মিলুর পাস করে বেরোতে এখনো দেরি। মীনার বিয়ে কবে হবে কে জানে। আর, তার মা তার ঘাড়ের বোঝাটাকে হাল্কা করবার

জন্মে সারারাত জেগে পরের বাড়ির জামা সেলাই করছে। হয়তো অনেকদিন থেকেই মা এইভাবে ছুটো পয়সা ঘরে আনবার চেষ্টা করছে, সে জানে না। সেদিন মা ধরা পড়ে গিয়েছে। মা তাই সেদিন তার মুখের দিকে তাকাতে পারে নি। সেদিন সে মাকে কিছু বলেনি। আজ সকালে কথাটা আবার মনে পড়ায় ভীষণ খারাপ লাগছে তার। না, মাকে একবার বলতেই হবে, সে যেন আর পরের বাড়ির জামা সেলাই না করে। কি দরকার? সে তো যা-হোক একটা চাকরি করছে। তাতে যেমন-করে হোক ওদের চলে যাবে। মান-ইজ্জৎ বলে তো একটা কথা আছে। আর সে এখনো ভোলেনি, তার বাবা আর কিছু না হোক, একজন অফিসার তো ছিল। সে ঠিক করলো, মাকে একদিন সে বারণ করবে ওসব করতে।

দাড়ি কামানো সেরে বেরিয়ে দেখলো, মিলু বাথরুমে ঢুকেছে। মিলুকে তাড়া দিয়ে সে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। দরজার কাছে ছায়া ফেলে একটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো। পাশেব বাড়ির চিকু একটা বাচ্চা মেয়ের হাত ধরে এসে নীলুকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞেস করলো : মাসীমা কোথায়, নীলুদা ?

চিকু আগে কত ছোট ছিল! এখন সে বেশ বড়ো হয়েছে, শাড়ি পরে। বাইরে কোথাও যেতে হলে তার হাতের মুঠোয় একটা বাচ্চার হাত চাই। নীলুদের বাড়ি সে আগে একা-একা আসতো। এখন চিকু একা আসতে পারে না।

মা চিকুর গলা শুনে বেরিয়ে এসে ওকে ঘরে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে জামার একটা প্যাকেট হাতে নিয়ে চিকু বেরিয়ে যেতে যেতে কি ভাবলো। ফিরে তাকিয়ে বললো : আসি নীলুদা—

: আচ্ছা—

নীলু একটু হাসলো। কিন্তু চিকু কি জন্মে এসেছিল, তা মার আড়াল সত্ত্বেও নীলুর বুঝতে বাকি রইলো না। ইস, মা শেষে পয়সার

জন্মে চিকুদের জামাও সেলাই করছে। সে জানে, চিকুদের অবস্থা কোনদিনই ভালো ছিল না। মাকে এসব বন্ধ করার জন্মে একদিন তাকে বলতেই হবে।

এখনো মিলুর হলো না? নাঃ, আজ 'অকিসে' দেরি করিয়ে ছাড়লো ও।

মিলু বেরিয়ে এলে সে হুড়মুড় বাথরুমে ঢুকে কয়েক মগ জল ঢেলে বেরিয়ে এলো। মা গরম ভাত বেড়ে পাখা দিয়ে হাওয়া করছিল। কোন কথা না বলে সে কয়েক গাল খেয়ে উঠে পড়লো। মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো : একেবারে খেলি না যে ?

: সময় নেই, মা। লেট হয়ে যাবে—

জামা পরতে গিয়ে মনে পড়লো, আজ শনিবার। বিকেল আড়াইটের সময় তাকে মেট্রো সিনেমার নিচে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। পীষ্বের জামাটা এখনো সে ফেরত দেয়নি। সেইটে গায়ে ছিল, পাটভাঙা একটা প্যান্ট পরলো। দরজার কাছে টিকিনের কৌটো হাতে নিয়ে মা দাঁড়িয়ে ছিল। টিকিনের কৌটোটা নিয়ে নীলু কি একটু ভাবলো।

: আজ তো শনিবার, মা। আজ আর টিকিন নেবো না।

কৌটোটা মার হাতে ফেরত দিয়ে বেরোতে গিয়ে দরজার কাছে দেখা হয়ে গেল হরশংকরবাবুর সঙ্গে।

: এই যে নীলু, বোঁমাও আছো, দেখছি—

নীলু ব্যস্তভাবে বললো : আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, জ্যাঠামশাই।

: আমারও খুব সামান্য কথা—

: আপনি মার সঙ্গে কথা বলুন—

খুব রহস্যময় হাসি হেসে তিনি বললেন : এতক্ষণে কথাটা আমার বলাই হয়ে যেত।

নীলু হতাশভাবে বললো : বলুন—

‘ : অনেক ভাড়া বাকি পড়ে গেছে। তোমরা এবার অল্প কোথাও বাড়ি দেখ।

নীলু বলে : এই তো সেদিন একমাসের ভাড়া দিয়ে এলুম !

: কিন্তু আবার তো ছ’মাসের হয়ে গেল।

নীলু যাবার জন্তে ছট্‌ফট্‌ করছে। বললো : ঠিক আছে। পরের মাস থেকে বেশি করে দিয়ে দেওয়া যাবে।

মা দরজার আড়াল থেকে বললো : আমি তো বলেছি, একটু রুয়ে-বসে দেবো। এখন ছেলেপুলে নিয়ে কোথায় যাই আর? দেখতেই তো পাচ্ছেন—

মার কথা যেন ঠুঁর কানেই গেল না। বললেন : তুমি আর বেশি দেবে কোথেকে, নীলু? করো তো একটা বেয়ারার চাকরি। কত পাও, তা কি আমি জানি না, মনে করেছো?

নীলুর মাথাটা রি রি করে উঠলো। বললো : ওসব বলার আপনার কোন রাইট নেই।

: ছ’মাসের ভাড়া বাকি পড়েছে। তাছাড়া তোমরা আমার আপনার লোক। তাই বললাম।

নীলু বললো : আমার এখন আর সময় নেই। তবে জেনে রাখুন, যেভাবে পারি, আপনার ভাড়া আমি শোধ করে দেবো। এখন আসছি—

নীলু শুনলো হরশংকরবাবু বলছেন : বাড়িটা ছেড়ে দিলেই সব চেয়ে ভালো করতে তোমরা—

নীলুর মনটা বিধিয়ে যায়। সে যে কোন উঁচু দরের কাজ করে না, মাইনে কম—সামান্য বেয়ারার কাজ, এইটে সবাইকে ভালোভাবে জানিয়ে দেবার জন্যেই যেন লোকটা এসেছিল। কিন্তু আশ্চর্য, লোকটা এসব জানলো কোথেকে? এখন লোকটার ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছে নীলুর। ইস, শুধু শুধু লোকটা অসম্ভব দেরি করিয়ে দিল।

বাসে ভিড় বেড়ে গেছে। ভিড়ের জন্তে একটা বাস ছেড়ে

দিল সে। পরের বাসের পাদানিতে কোনমতে পা চুকিয়ে দিয়ে, মাড্‌গার্ডের ওপর আরেকটা পা ভুলে দিয়ে সে ছাণ্ডেল ধরে বুলে রইলো।

তবু অফিসে কয়েক মিনিট দেরি হয়ে গেল তার। হেডক্লার্ক রমেনবাবু তার দিকে আড়চোখে তাকালেন। এই রমেনবাবু লোকটা কোন অজ্ঞাত কারণে তাকে পছন্দ করেন না। নতুন চুকেছে সে। এখনো কাজকর্ম ঠিকমতো বুঝে নিতে পারেনি। রমেনবাবু ওসব কিছুই শুনেতে চান না। কথায় কথায় উনি নীলুর কাজের খুঁত ধরেন। বলেন : এটা সরকারী অফিস নয় হে। এ রকম হলে চলবে না।

রমেনবাবুকে আড়চোখে তাকাতে দেখে নীলু হেসে বলে : আজ একটু দেরি হয়ে গেল, স্মার। বাসে যা ভিড়!

রমেনবাবুও মনে হলো খুব বেশিক্ষণ আগে আসেননি। এখনো উনি হাত-পা ছড়িয়ে চেয়ারে বসে জিরোচ্ছেন। বললেন : একটু আগে-ভাগে বেরোও না কেন? এ রকম হলে কিন্তু চলবে না। দাও, শিগ্গীর একগেলাস জল দিয়ে লেজার বুকটা বের করো।

সঙ্গে সঙ্গে নীলুর কাজ আরম্ভ হয়ে গেল।

কাজের কঁাকে রমেনবাবু একবার তার দিকে আড়চোখে তাকালেন।

: কোথায় যাওয়া হবে আজ?

নীলু হেসে বললো : কোথাও না, স্মার।

: শনিবারের বাজার। আর এই মেক-আপ। দেখলেই মনে হয়—

নীলু কোন জবাব দিলো না।

: মাঠে যাবার অভ্যেস আছে নিশ্চয়—

নীলু জিজ্ঞেস করলো : খেলার মাঠের কথা বলছেন?

: তুমি যে এত সেরানো, তা তোমাকে দেখে মনে হয় না কিন্তু—

কথাটা শুনে হাসি পেল নীলুর। হাসতে হাসতে রমেনবাবু বললেন : চোখে-মুখে একটা ইনোসেন্ট-ইনোসেন্ট ভাব লাগিয়ে থাকলেই এই রমেন মল্লিকের চোখকে কাঁকি দেওয়া যাবেজ্ঞা।

নীলু অস্ত কাজে চলে যাচ্ছিল। রমেনবাবু বললেন : যাচ্ছে কোথায় ? আরে শোনো, আমার এক মেসো ঘোড়া আর মাঠ করতে করতে একদিন রাস্তিরে ঘুমের ভেতর বাজি জেতার আনন্দে বিছানা থেকে সোজা মেঝের ওপর—মাথা কেটে এখন হাসপাতালে।

নীলু বললো : আপনার মেসোর সঙ্গে আমার একটু আলাপ করিয়ে দেবেন ?

রমেনবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

ছোটো বাজতে কয়েক মিনিট বাকি থাকতে রমেনবাবু নীলুকে ডাকলেন। একখানা সীল-করা চিঠি ওর হাতে দিয়ে বললেন : শিগ্গীর এই চিঠিটা 'ক্রক সল'-এ দিয়ে জবাব নিয়ে এসো।

নীলুর মাথার আকাশ ভেঙে পড়লো। সে ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিল। ছোটো বাজলেই কেটে পড়বে। কিন্তু রমেনবাবু ইচ্ছে করেই তার যাওয়া কাঁসিয়ে দিলেন। নীলু বললো : এখন তো ছোটো বাজ। কাল গেলে হবে না ?

: কাল তো রৌববার। চিঠিটা খুব জরুরী—

বলেই রমেনবাবু খুব ব্যস্ততার ভান করে একটা হিসেবের খাতায় মন দিলেন।

একটা অমাত্মিক ক্রোধে জ্বলতে জ্বলতে চিঠিটা নিয়ে নীলু বেরিয়ে যায়। কিরলো যখন, তখন তিনটে বেজে গেছে। এখনও কি আর রমলাদি মেট্রোর নিচে দাঁড়িয়ে আছে ? তার বুকের সবখানি ক্রোধ রমেনবাবুর ওপর কেটে পড়তে চাইছে। একদিন যদি সে সুযোগ পায়, এই রমেনবাবু লোকটাকে একবার দেখে নেবে। তাহলে হরশংকরবাবুকেও সে ক্ষমা করবে না।

জানে, রমলাদির সঙ্গে আর দেখা হবে না। তবু অফিস থেকে বেরিয়ে সে লম্বা লম্বা পা ফেলে মেট্রোর দিকে এগোয়। রাস্তা জ্যাম।

লোকের ভিড়ে পা চালানো দায়। ভিড় ঠেলে মেট্রোর কাছে
যখন সে পৌঁছলো, তখন সাড়ে তিনটে।

না, তখন মেট্রোর সামনে কোন দেবী-মূর্তি তার জগ্গে দাঁড়িয়ে
ছিল না।

নীলু প্রথমে কি করবে, ভেবে পেল না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে
থেকে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলো। নিশ্চয়ই রমলাদি তার
কথামতো এখানে এসেছিল। তার জগ্গে অপেক্ষাও করেছিল হয়তো
অনেকক্ষণ। তারপর বিরক্ত হয়ে ফিরে চলে গেছে। এখন তার সব
রাগ রমেনবাবু লোকটার ওপর পড়ছে। লোকটা এমন অসময়ে তাকে
পাঠালো, যার ফলে তার সব ওলটপালট হয়ে গেল।

কী আর করবে সে, আন্তে-মুন্তে বাড়ি ফিরে যাওয়া ছাড়া ?
নিজের মনে হাঁটতে থাকে সে। এখন ভাবে, এই ভালো।
রমলাদির সঙ্গে দেখা না হয়ে ভালোই হয়েছে। কে রমলাদি ?
শবরীর এক বয়স্ক বন্ধু ছাড়া তো তার কাছে তার অন্ত কোন
পরিচয় নেই। কাজেই, কেন সে মিছিমিছি রমলাদির সঙ্গে দেখা
করবে ? যদি রমলাদি না হয়ে শবরী হতো, তাহলে অন্ত কথা
ছিল। শবরীর কথা মনে পড়ায় এত ক্লান্তি সত্ত্বেও তার প্রতিটি
রোমকূপের ওপর দিয়ে একটা মিহি হালকা বাতাস শিস্ দিতে
দিতে বয়ে গেল।

: নীলিম—

খুব কাছে থেকে এ নামে তাকে কে ডাকলো ? এ নাম তো
তার সবার জগ্গে নয়। শুধু শবরী, হ্যাঁ, একমাত্র শবরীর জগ্গেই
তার এই নাম। নীলু ফিরে ডাকলো। শবরী নয়, নীলু সেই
পবিত্র দেবী-মূর্তিকে দেখে অবাক হয়ে গেল। রমলাদি তাহলে
ফিরে চলে যায়নি ?

: 'এই তোমার আড়াইটে ?

: অফিসের একটা জরুরী কাজে আটকিয়ে পড়েছিলুম,
রমলাদি—

রমলাদি ঠোট চেপে হাবলো। বললো : শবরী ডাকলে
অকস্মে নিশ্চয় বারোটা থেকে কাজ থাকতো না।

নীলু এডটা আশা করেনি। বললো : সত্যি বলছি রমলাদি,
উপায় ছিল না।

রমলাদি ওর কথা কানেই নিলো না। বললো : কার কথা
ভাবতে ভাবতে যাওয়া হচ্ছিল ? একেবারে তন্দ্রায়—

নীলু হাসলো। তারপর খুব সাহস করে বলে কেললো :
তোমার কথাই ভাবছিলুম, রমলাদি—

: হয়েছে, থাক্।

: ভাবছিলুম, তুমি এসে হয়তো ফিরে চলে গেছো। আমার
ভীষণ লজ্জা করছিল কথা রাখতে পারলুম না বলে—

: চলো, গঙ্গার ধারে গিয়ে একটু বসি—

এসপ্লানেডের ভিড় পেছনে কেলো ওরা গঙ্গার ধারের দিকে চললো।
রোদ্দুর ছিল না। বড় এককালি মেঘে সূর্য ঢাকা পড়ে গিয়েছিল।
ছায়ার ভেতর দিয়ে হাঁটতে নীলুর নিজেই অহংকারী মনে হচ্ছিল।

৫ ছটো থেকে এসে দাঁড়িয়ে ছিলুম। যখন পৌনে তিনটে
বাজলো, তখন ভাবলুম, তুমি আর এলে না। তখন কি আর
করি ? সুবিনয়বাবুর চেয়ার থেকে একটু ঘুরে এলুম। ভেবেছিলুম,
তুমি এলে নিশ্চয়ই একটু অপেক্ষা করবে। আমি যদি একটু
দেরি করতুম, তাহলে তো দেখাই হতো না—

নীলুর বুকের ভেতর সেই নীলশিখাটা আজ আবার চিন্চিন্
করে উঠলো। হাতের তালুতেও ঘাম জমছে। হঠাৎ নীলুর মনে
হলো, এ ঠিক নয়। পকেট থেকে রুমাল বের করে কপাল,
নাকের পাটা ছটো আর হাতের তালু সে রগড়ে মুছে নেয়।

: সুবিনয়বাবু কে, রমলাদি ?

: আমাদের চেনা-জানা। খুব ভালো মানুষ—এখানে চেয়ার
আছে ওর।

: ডাক্তার ?

: না।

: তবে কিসের চেস্বার ?

: জানি না। কিন্তু মানুষটি অতি চমৎকার। দাঁড়াও, তোমাকে একদিন নিয়ে যাবো। আলাপ করে দেখো—

রমলাদির কথায় নীলুর কোন উৎসাহ নেই। সে একটা অদৃশ্য নীলশিখা নিয়ে তখন ভীষণ বিব্রত।

রমলাদি নীলুর চোখে কোনাকুনি তাকালো। তারপর হেসে উঠলো।

: কি ? সুবিনয়বাবুর নাম শুনে গস্তীর হয়ে গেলে যে ?

নীলুর কপালে দ্রুত কয়েকটা ভাঁজ পড়লো।

: না, আমি অন্য কথা ভাবছি।

: শবরীর কথা ?

নীলু স্পষ্টত একটু বিরক্ত হয়।

: ভাবছো, মেয়েটা কি বাচাল—তাই না ?

রমলাদির মুখখানা হঠাৎ করুণ দেখায়। কয়েক মিনিটের নীরবতা। তারপর রমলাদি হাঁপাতে হাঁপাতে বলে : একটু আস্তে হাঁটো। তোমার সাথে হাঁটতে গিয়ে হাঁপিয়ে পড়েছি।

নীলুর পাশে রমলাদি ধীরে-সুস্থে হাঁটতে থাকে।

: আচ্ছা নীলিম, দিল্লী থেকে ফিরে অন্দি মেয়েটার আব অন্য কথা নেই। কেন বলো তো ?

: কে, শবরী ?

: আমাকে চিঠি লিখেছে, তাতেও শুধু তোমারই কথায় পাতা ভর্তি। কি হয়েছিল, বলো তো ?

নীলু রমলাদির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

: কিছুই তো হয়নি, রমলাদি।

রমলাদি হেসে উঠলো।

: না, কিছুই হয়নি ! তুমি বললে, আব আমি তাই বিশ্বাস করলুম !

: বিশ্বাস করো, রমলাদি—

রমলাদি গম্ভীর হয়ে যায়। বলে : একটা ঘরের মধ্যে হুজনে চার-চারদিন কাটিয়েছো। কি, কথা বলছো না বে? বলো, কাটাওনি ?

: কে তোমাকে একথা বললো, রমলাদি ?

: কেউ বলেনি। বলো, কাটাওনি ?

: কিন্তু ওকথা তুমি জানলে কি করে, রমলাদি ?

রমলাদি কিছু না বলে রহস্যময় হাসি হাসে।

নীলু খপ্ করে রমলাদির একখানা হাত চেপে ধরে : তোমাকে বলতে হবে, রমলাদি, তুমি কি করে জানলে। নইলে আমি আর একপাও এগোবো না।

: চলো, বলছি—

বুকের ভেতরটা নীলুর অস্থির জলছিল। সমস্ত রক্তের মধ্যে একটা ভয়ানক বকমের অগ্নিকাণ্ড। সেই সঙ্গে একটা আঠালো বিশ্বাস তার গলা বেয়ে ওপরে উঠে আসছে।

: তোমাকে বলতে পারি। বলো, তুমি শবরীকে বলবে না ?

নীলুর ছুচোখের ওপর রমলাদি চোখ রাখলো। নীলু রমলাদির হাত ছেড়ে দিল। বললো : থাক, বলতে হবে না।

নীলু গঙ্গার ধার পর্যন্ত আর কোন কথা বলেনি। সে শুধু ভেবেছে, তাকে বারণ করে শবরী কি করে ওকথা রমলাদিকে বলতে পারলো? বলবেই যদি, তাকে সে বারণ করলো কেন? আর বারণ করে নিজেই বা বলতে গেল কেন ওসব কথা?

একটু আগে মেঘ সরিয়ে সূর্য বেরিয়ে এসেছিল। আবার মেঘ ঢেকে গেল। গঙ্গার তখন জোয়ার। জল অনেক উঁচুতে উঠে এসেছে। ওপারে আকাশের আলোর বিপরীতে বিদেশী জাহাজগুলোকে ভীষণ জীবন্ত মনে হচ্ছিল তার।

নীলু ভেতরে ভেতরে জলছিল। তার সমস্ত অস্তিত্বটা গুড়ছিল। সে জানে, এটা তার একটা গোপন অনুভব। এই

অম্বুখের কথা পৃথিবীর কেউ জানে না, কেউ জানবেও না। সে এবং তার অম্বুখ পরম্পর একই আঙুনে জ্বলতে জ্বলতে একদিন শেষে নিবে যাবে। চারদিকের মানুষ, এই আকাশ, নদী, ওপারের নীল শহর, জাহাজ—সব কেমন নির্বিকার !

ঠিক এই ভাবনা এলেই তার কান্না পায়। তখন কারো বুকে মুখ রেখে তার কাঁদতে ইচ্ছে হয়। এই সময়টা হুমিনিট কারো বুকে মুখ রেখে কাঁদতে পারলে সে একটু হাল্কা হতে পারতো ! রমলাদি, তুমি আমাকে তোমার বুকে মুখ রেখে একটু কাঁদতে দেবে ?

: ভাবছো, মেয়েটা কী বাচাল—তাই না ?

নীলু রমলাদির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। পশ্চিম আকাশ থেকে একটা চাপা আলো তার মুখের ওপর পড়েছিল। সেই আলোতে রমলাদির মুখখানা ঠিক প্রতিমা-প্রতিমা মনে হচ্ছিল।

তুজনে বসলো পাশাপাশি।

নীলু নদীর স্রোতের দিকে চেয়ে চূপচাপ বসে থাকে। দেখতে দেখতে সমস্ত মুছে যায়—মা, হরশংকরবাবু, অফিসের রমেনবাবু, শবরী, তন্দ্রাদি, পেছনের কলকাতা—সমস্ত কিছু। মনে হলো, সে আর রমলাদি এখানে যেন অনেক—অনেক দিন ধরে বসে আছে, যেন অনেক যুগ। তখন রমলাদির বুকের আড়াল খসে যায়।

: জানো নীলিম, এমনি এক সন্কেবেলা আমার বিয়ে হয়েছিল। আমার বিয়েতে কেউ মন্ত্র পড়েনি, কেউ শাঁখ বাজায়নি একটা পোড়ো বাড়ির কাঠের ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় হিমাজি বললো, আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলুম না। আমাকে সই করতে বলেছে, করেছি, আর কিছু জানি না।

ছেলেবেলায় আমি খুব ডানপিটে মেয়ে ছিলাম। খেলাধুলো, থিয়েটার, নাচগান, হৈ-হুল্লোড়ে আমার জুড়ি ছিল না। একবার আমার বয়েস যখন চৌদ্দ-পনেরো, আমি পাড়ার থিয়েটারে চণ্ডালিকায় প্রকৃতি সাজেছিলাম। সিনের কাঁকে উইংসের আড়ালে অঙ্ককারে

আমার নাচের তারিক করতে এসে আমার বাবার বয়েসী একটা সুন্দরমতন লোক আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছিল। তারপর থেকে বাইরে বেরোতে আমি ভয় পেতাম। কিন্তু ভেতরে-ভেতরে আমার সাহস খুব বেড়ে গিয়েছিল। মনে মনে একটু গর্বিত যে না-হয়েছিলুম, তা নয়।

আমাদের পাশের বাড়ির সঙ্গে আমাদের সন্ধ্যা ছিল না। অথচ সেই পাশের বাড়িতেই হিমাজি আসতো। ওটা ছিল ওর মাসীর বাড়ি। হিমাজি আমাকে দেখতো, আমিও হিমাজিকে দেখতুম। কয়েক বছর কেটে যায় একইভাবে। একদিন হিমাজি আমাকে বললো, জানালায় বসে কি করছো? বাইরে চলো না। বললুম, কোথায়? ও বললো, পার্কের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। চলে এসো। ছুজনে সেদিন গেলুম সিনেমায়। কথায় কথায় বললো, ও খুব শিগ্গীর পাইলট হচ্ছে। তারপর কখনো গেছি পার্কে, কখনো এসেছি গঙ্গার ধারে, কখনো সিনেমায়, কখনো ঢাকুরিয়া লেকে। বাড়িতে মিথ্যে কথা বলে আমার গৌড়া বাবা-মাকে চুপ করিয়েছি। একদিন হিমাজি বললো, চলো, বিয়ে করি। অনেক ভেবে-চিন্তে আমি রাজী হয়ে গেলুম। তারপর অতিকষ্টে আমার এক বন্ধুকে জোগাড় করলুম। হিমাজিও সঙ্গে জন-দুই বন্ধু নিল। আমরা একটা পোড়ো বাড়ির ভাঙা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেলুম। দোতলায় ম্যারেজ-রেজিস্ট্রার বুড়ো আমাদের দিয়ে কয়েকটা সই করিয়ে নিল। আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না। হিমাজি আমাকে বললো, চলো, আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে। ঠিক পুতুল খেলার মতো—পুতুলের বিয়ের মতো আমাদের বিয়ে হয়ে গেল।

হিমাজির বাবা-মা আমাকে বাড়ির বৌ-এর মতো নয়, মেয়ের মতন গ্রহণ করলেন। আমার বাবা-মা, আগেই বলেছি, খুব গৌড়া ছিলেন, তাঁরাও উপায় না দেখে, সেই পুতুলের বিয়ে স্বীকার করে নিলেন।

রমলাদি একটু খামলো। সামনের অঙ্ককারের দিকে চেয়ে আবার বলতে লাগলো : হিমাত্রি আমাকে পাগলের মতো ভালোবাসতো। ক’দিন বাদেই সে পাইলট হলো। দেখতে দেখতে মাঝে ছ’য়েক কেটে গেল। একদিন ভোর রাত্তিরে হিমাত্রি অফিসের গাড়ি করে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় বলে গিয়েছিল, রাত দশটার মধ্যে সে ফিরে আসবে। কিন্তু আর সে ফিরলো না। ছুদিন পরে কাগজে পড়লুম, পাইলট এইচ বাসু প্লেন ক্রাশে—

রমলাদি চোখ মুছলো।

: মাত্র ছ’মাস আমি হিমাত্রিকে পেয়েছিলুম। তারপর সে হঠাৎ চলে গেল। বাবা-মা এসেছিল আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্তে। আমি গেলুম না। পাঁচ বছর কেটে গেল। শ্বশুরমশাই একদিন বললেন, বৌমা, আমার ভো মেয়ে নেই। তুমিই আমার মেয়ে। হিমু যখন চলে গেছে, তখন তুমি যদি চাও, আমি তোমাকে আবার বিয়ে দিয়ে দিতে পারি। তোমাব বয়েস অল্প। হিমু যখন আর ফিরে আসবে না, তুমি কেন ওর জন্তে বসে থেকে জীবনটা নষ্ট করবে? জানো নীলিম, আমি রাজী হলাম না। এনটাকে বাঁধবার জন্তে লেখাপড়া শুরু করলুম। শ্বশুর-শাশুড়ীব পারমিশন নিয়ে কলেজে ভর্তি হলাম। সেইখানে শবরীর সঙ্গে পরিচয়।

একটু খামলো রমলাদি।

: এখন আমি যেখানে খুশি, যখন খুশি বেরোতে পারি। আমার এখন অবাধ স্বাধীনতা।

সূর্য ডুবে গিয়েছিল। আলো মুছে গিয়ে অঙ্ককার নামছিল চারদিকে। বিদেশী জাহাজগুলোতে আলো জ্বলে উঠলো একসঙ্গে।

নীলু বললো : তাহলে তুমি বিয়ে করছো না কেন, রমলাদি ?

রমলাদি আরো কাছে সরে এলো। বললো : প্রথম প্রথম বিয়ের কথা ভাবলেই হিমাত্রির মুখটা মনে পড়তো। সত্যি বলছি, নীলিম, এখন আর পড়ে না। এখন ভাবি, সত্যিই তো—কেন আমি ওর জন্তে সারা জীবন বসে থাকবো? জানি, হিমাত্রি আর

কোনদিন কিরবে না। তবু আট বছর আমি ওর পথের দিকে চেয়ে বসে আছি। এরপর তো আমি শেষ হয়ে যাবো, নীলিম। সময় তো আমাকে গ্রেস মার্ক দেবে না! বলো?

: বেশ তো, তাহলে—

নীলুকে রমলাদি কথা বলতে দিল না। বললো: তাহলে শোনো। শবরীর সঙ্গে আমার পরিচয় যখন ঘনিষ্ঠ হলো, তখন শবরী আমাকে ওর বাঁড় নিয়ে গিয়েছিল। কেন জানি না, শবরীকে আমার ভীষণ ভালো লাগে। ওর চয়নকাকুর সঙ্গে পরিচয় হলো। ওর চয়নকাকুকে তো দেখেছো, ভারি চমৎকার মাহুষ। প্রথম দিনেই ঠুঁকে আমার ভীষণ ভালো লেগে গেল। ভুল্ললোককেও দেখে মনে হতো। উনি আমাকে কিছু বলতে চান। কিন্তু—তুমি বলবে না কাউকে বলো—

: বলবো না, তুমি বলো—

: শবরীকেও না—

: না।

: কিন্তু একজনের জন্তে উনি বলতে পারলেন না। বলো তো, কে সেই একজন?

নীলুর বুকেব ডেভব সেই নীলশিখাটা ডালপালা মেলছিল। জিজ্ঞেস কবলো: শবরী?

অন্ধকাবে রমলাদির গলার স্বর স্পষ্ট শোনা গেল : না।

: তবে?

: শবরীর মা।

বিশ্বয়ে নীলুর কথা বলার ক্ষমতা রইলো না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বললো: তুমি কি বলছো, রমলাদি?

: বিশ্বাস হচ্ছে না তো? আমিও প্রথমে বিশ্বাস করে উঠতে পারিনি। পরে শবরীর কাছ থেকেই শুনলুম, শবরীর বাবা যখন মারা যান, তখন শবরীর বয়েস ছিল এক বছর। শবরী আর একদিন আমাকে কথার কীক বলছে কবরী তার চেয়ে চার বছরের ছোট।

নীলু রমলাদির কথা বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না। বলে: এও কি সম্ভব ?

রমলাদির গলা শোনা যায়: কেন সম্ভব নয়? ভদ্রমহিলার ব্যয়স তেমন কিছু বেশি নয়। আর একথা বুঝছে না কেন, আঠারো বছর আগে ভদ্রমহিলার ব্যয়স আরো কম ছিল।

নীলুর মুখে কোন কথা ছিল না। সামনের জাহাজটার কেবিন থেকে আলোর ছুরিগুলো সঙ্কেত অঙ্ককারটাকে টুকুরো টুকুরো করে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। নীলু বুঝতে পারছে না, তার কী যেন আজ থেকে টুকুরো টুকুরো হয়ে যাচ্ছে।

: চলো, ওঠা যাক, রমলাদি।

একটা দীর্ঘশ্বাস রেখে উঠে দাঁড়ায় নীলু। হাত বাড়িয়ে রমলাদি নীলুর এন্ট্রীতে ধরলো।

: তোমাকে দেখার পর থেকেই আমার যে কী হয়েছে!

গঙ্গার জলে তখন জাঁটার টান ধরেছিল। জল শব্দ করে ছুটে যাচ্ছিল স্বাভাবিকভাবে। নীলুর সামনে অঙ্ককারও কাঁপতে কাঁপতে ছুটছিল এক অনিবার্য কারণে। বৃকের ভেতরে আগুনে পুড়ছিল একটা সরল গাছ। কাণ্ড ফেটে গড়িয়ে পড়ছিল তার দরানো রস।

অঙ্ককার থেকে বেরিয়ে তারা একটা লাইট পোস্টের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটি অল্পবয়সী ছেলে নীলুর সামনে এসে দাঁড়ালো।

: দাদা, একটি অমরোধ—

নীলু ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ছেলেটির ব্যবহারে ভয়ের কিছু ছিল না। গায়ে টেবিলিনের জামা, ভদ্রঘরের ছেলে। সে ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলো: কি ভাই?

: দেখুন, আমি ভিখিরি নই। কোন ভিক্ষে চাইছি না আপনার কাছে। বিকেলে খেলা দেখতে এসেছিলাম। মাঠে পকেটমার হয়ে গেছে। বাড়ি ফেরার পয়সা নেই। বাসে যাবো—

: কত লাগবে তোমার?

: আমরা তিনজন। যাবো কাশীপুর। সবশুদ্ধ একটা টাকা
হলে হয়ে যাবে।

সে ময়দানের অঙ্ককারের দিকে চেয়ে তার বাকি দুজন বন্ধুকে
ডাকলো : কেঁটা—

বন্ধুরা সঙ্গে সঙ্গে এসে গেল।

নীলু পকেট হাতড়ে বললো : আমার কাছে বাড়তি পয়সা
তো হবে না!

: ঠিক আছে, আমি দিচ্ছি—

বলে রমলাদি তার ব্যাগ থেকে এক টাকার একখানা নোট
ছেলেটির হাতে দিল। ছেলেটি যুক পকেট থেকে একটা ছোট
নোটবুক বের করে বললো : আপনার ঠিকানাটা দয়া করে বলুন।
টাকাটা কাল কিংবা পরশু ফেরত দিয়ে আসবো।

রমলাদি বাধা দিয়ে বললো : তার দরকার হবে না। এ
টাকা ফেরত চাই না।

ছেলেটা মুখখানা কাচুমাচু করে বললো : আমরা ভদ্রলোকের
ছেলে। নেহাত বিপদে পড়েছি, তাই। আমরা কিন্তু ভিক্ষে
চাইছি না।

নীলু বললো : ঠিক আছে! দাও তোমার নোটবুক। আমার
ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। সুবিধে হলে দিয়ে এসো। তবে—না দিলেও
চলবে।

ছেলেটি নোটবইটা খুলে নীলুর হাতে দিল। নোটবই হাতে
নিয়ে বললো : আমার কাছে তো কলম নেই। তোমাদের কারো
কাছে কলম আছে?

: কেঁটা, দাদাকে তোর কলমটা দে—

কেঁটা কলমের মতো দেখতে কিন্তু লম্বা এবং ভারী একটা জিনিস
নীলুর হাতে দিল। নীলু খুলতে কেঁটা করলো পারলো না।

: দাদা খুলতে জানে না। খুলে দে পেনটা—

কেঁটা ওটা হাতে নিয়ে একটা চাবি টিপতেই পটাং করে একটা

চক্চকে ছুরির ফলা ছিট্কে বেরিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে বাকি ছজনের হাতে ছুটো ভোজালি চম্কে উঠলো।

: চেষ্টাবেন না। কাছে কি আছে, জলদি জলদি দিয়ে দিন।'

নীলু বলে : আমার কাছে কিছুই নেই ভাই, বিশ্বাস করো !

: ফুকোটে প্রেম করতে আসা হয়েছিল দাদার ? ঠিক আছে, দিদির কাছে যা আছে, দিয়ে দিন।

ভয়ে রমলাদি হাতের ঘড়ি খুলে দিল।

ছেলেটা বললো : দিদির গলায় হার আছে দেখছি !

: ও, হারটাও তোমাদের চাই ? নীলু, হারটা খুলে দাও তো।

রমলাদির গলায় নীলু যখন হাত দিল, তখন তার হাতছটো ভীষণ কাঁপছিল।



মাস-পয়লায় মাইনে পেয়ে নীলু চার টাকা নয়, পাঁচ টাকাই মীনার হাতে দিল। মীনার জামা নেই, মীনা জামা বানাবে। বাকি টাকাটা পকেটে নিয়ে মিলুকে বললো : চল মিলু, তোকে একটা জামা আর একটা প্যান্ট কিনে দিই।

মাত্র একটা জামা আর একটা প্যান্টে মিলুর খুব অসুবিধে হচ্ছে। বোজ ক্লাস করতে যেতে হয়। কত ধনী ঘরের ছেলেমেয়েরা তার সাথে পড়ে। বাবা কত দামী দামী জামা-কাপড় পরে আসে। মিলুর সেই এক জামা, এক প্যান্ট। তাও ঘামে আর কালিঝুলিতে একেবারে গ্নাতা না হলে কাচা হয় না। নীলু এ সব বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেছে।

মিলু বলেছিল : আমাকে টাকা দিয়ে দে, আমি নিজে কিনে নেবো।

: উহু, ওটি হবে না। আমি নিজে তাকে দোকানে নিয়ে গিয়ে কিনে দেবো।

শেষে নীলুর প্রস্তাবেই মিলুকে রাজী হতে হয়।

হাতিবাগানের সবচেয়ে বড় দোকানে ঢুকে নীলু পেছন কিরে দেখলো, মিলু নেই। কোথায় গেল মিলু? সঙ্গেই তো আসছিল এতক্ষণ? নীলুকে বেরিয়ে যেতে দেখে দোকানের মালিক উঠে এলেন। মালিক নীলুকে ভালোভাবেই চেনেন। বাবা থাকতে এই দোকানে বছরে বেশ কয়েকবার আসতে হতো তাদের। এখন তারা এ দোকানে আসার পথই ভুলে গেছে। কিন্তু দোকানের মালিকের মনে করে রাখার শক্তি অসাধারণ। উনি ভিড় ঠেলে এসে নীলুর পথ আগলে দাঁড়ান।

: আজকাল তো আপনার বাড়ির কারো পায়ের ধুলো এ দোকানে পড়ে না, স্মার।

‘স্মার’ সম্বোধনে নীলুর মনের ভেতরটা বেশ গলতে শুরু করেছিল।

: ক’বছর বাদে এলেনই যখন দয়া করে, তখন চলে যাচ্ছেন কেন স্মার?

: দাঁড়ান, আমার ভাই সঙ্গে আসছিল, কোথায় গেল আগে দেখি—

: দেখুন, আসবেন কিন্তু—

নীলু বেরিয়ে আসছিল। ভদ্রলোক কি ভেবে দ্রুত এগিয়ে এসে নীলুর কানের কাছে মুখ এনে খুব বিশ্বস্ত ভঙ্গিতে বললেন : খাতায় বড়বাবুর নামে কিছু বাকি আছে। তা বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল—

: বাকি?

নীলুর কপালের রগছটো টনটন করে উঠলো।

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন : মিথ্যেকথা বলছি নে। দেখবেন আশ্বিন—

: ঠিক আছে। পরে দেখবো’খন।

নীলু বেরিয়ে আসছিল। আসতে আসতে শোনে, ভদ্রলোক বলছেন : দেখবেন, গরিব দোকানদার আমরা—

নীলু দোকান থেকে বেবিয়ে এসে দেখলো, মিলু খানিক দূবে
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবছে। সে এতদূবে দাঁড়িয়ে ছিল যে,
দোকানদারের তাগাদা তাব পক্ষে শুনতে পাওয়া সম্ভব নয়।

নীলু ডাকে : দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? আয়—

মিলু কাছে এলো। বললো : এত বড় দোকানে যাস্নে, দাদা।
গলাকাটা দাম। আমাকে এই ফুটপাতের কোন দোকান থেকে
কিনে দে। দামে কম হবে।

নীলু ওকে বোঝাবাব চেষ্টা কবলো, বড় দোকানের জামাব অণ্ড
কদব আছে, -ফিটি, ভালো, টেকে ও বেশি। একটা কিনলে
অনেকদিন চলে যাবে। কিন্তু মিলুকে বোঝানো গেল না। সে
ফুটপাতের একটা দোকান থেকে একটা জামা ও একটা প্যান্ট কিনে
বেশ মনের আনন্দ বাড়ি ফিবলো। বাকি টাকাগুলো মাকে দিতে
গিয়ে নীলু দেখলো, মা একমনে কাব একটা শাৰ্ট সেলাই কবছে।
নীলু ডাকলো : মা—

মা চমকে সেলাই বন্ধ বেখে পেছন ফিবে তাকালো।

: মিলুব একটা শাৰ্ট ও একটা প্যান্ট কিনে দিয়ছি, মীনাব জামাব
ছিটেব জাণ্ড পাঁচ টাকা দিয়ছি। বাকি টাকাটা তুমি বাখে—

মা টাকাগুলো হাতে নিয়ে কি ভাবলো। বললো : এতে
ছ'মাসেব বাড়ি ভাডা হবে না, নীলু ?

নীলু হিসেব কবে বললো : পাঁচ টাকা কম হয়।

মা কাপড়ের গিঁট, বালিশের তলা, সেলাই কলের ড্রয়াব একে
একে ছ' তিনবাব কবে খুঁজলো। তাবপব ডাকলো : মীনা—

মীনা কোমবে জড়ানো আঁচলে হাত মুছতে মুছতে এলো। সে
আজ খুব খুশি, তাকে দেখলেই বোঝা যায়।

মা জিজ্ঞেস কবলো : পাঁচটা টাকা বালিশের তলায় ছিল,
দেখেছিস ?

কপাল কুঁচকে বললো : না তো। দাদা পাঁচটা টাকা দিয়েছে,
তাই হাবমোনিয়মেব বাঞ্জে তুলে বেখেছি। দেবো তোমাকে ওটা ?

মা গম্ভীরভাবে বললো : না । মিলুকে একবার ডাক তো—
মীনা মিলুকে ডেকে আনলো :

: তুই আমার ঘর থেকে পাচটা টাকা নিয়েছিস্ ?

: নিয়েছি । কেন ? কি হয়েছে ?

মিলুর উত্তর দেবার ভঙ্গিটা কারো ভালো লাগলো না । তার
ও রকম উত্তর দেবার ধরন দেখে মা স্পষ্টত রোগে গেছে ।

: কেন নিয়েছিস্ ?

: এক বন্ধুর কাছে ধার করেছিলুম, তাকে দিয়ে দিয়েছি ।

: কেন ধার করেছিলি তুই ?

মার ছুচোখ ক্রোধে হঠাৎ দম্প করে জ্বলে উঠলো ।

: তুমি জামা সেলাই করে তো অনেক টাকা পাচ্ছে। আমাকে
পাঁচটা টাকাও দিতে পারো না ! পাচটা টাকা নিয়েছি বলে বাড়ি
মাথায় কবছো ?

দেখতে দেখতে মার চোখছোটো জলে ভবে এলো।—তা রাগে
কিংবা ছুখে ঠিক বোঝা গেল না । মিলু আস্তে আস্তে ঘব থেকে
বেরিয়ে গেল ।

: ৬ দিন দিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে, দেখছিস্ নীলু ?
বাড়ির কি हाल, সবই দেখছে । কিন্তু একটু যদি বোঝার চেষ্টা
করে—

মীনা দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল । কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে
এসে মার হাতে পাঁচটাকার একখানা নোট দিয়ে বললো : দাদা
দিয়েছিল জামার ছিট্ কিনতে । পরের মাসে কিনবোঁখন । এখন
তুমি কাজ চালিয়ে নাও, মা—

মার ছুচোখ জ্বলে ভেসে গেল । তা দেখে মীনা দৌড়ে ঘর
থেকে বেরিয়ে পালায় ।

: মেয়েটার গায়ে একটা জামা নেই । ছেঁড়া জামা রোজ
হবেলা সেলাই করে পরছে । আমি ওর কষ্ট দেখতে পারি না !

নীলু টাকা নিয়ে হরশংকরবাবুদের ওপরে গেল । সিঁড়িতে

একটা আবছা পাওয়াবেব আলো ছলছিল। হবশংকববাবু ঘবে বসে পুবােনো খববেব কাগজগুলো ওজন কবে বাখছিলেন। হবশংকববাবু কল্প মানুষ। শিবা-ওঠা হাতে অত্থানি ওজন তুলতে গিয়ে উঁনি ঠাঁ কবে খাস নিচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে শুকনো পাত্লা ঠোটে জিভ্ বুলিয়ে ভিজিয়ে নিতে হচ্ছিল।

নীলু ডাকলো : জ্যাঠামশাই -

নীলুকে এ সময়ে দেখে হবশংকববাবু একটু অপ্রস্তুত হলেন। চিবাচবিত হাসি মুখে নিয়ে বললেন। এসো নীলু, দাঁড়িয়ে বইলে কেন ? ভেতবে এসো। আজকালকাব কাগজওয়ালাগুলো পযলা নশবেব চাঁট। চোখে ধুলো দিয়ে ঠকাবই। তাই ওজন কবে বাখছিলুম—

: তা বাখুন ওজন কবে। আপনাব কাগজ আপনি ওজন কবে বাখছেন। তেত কাব কি বলাব থাকতে পারে ?

নীলু লক্ষ্য কবলো হবশংকববাবুর চিবাচবিত হাসিটা ঠোটেব ওপব কেল্লাব মতো গুটিয়ে গেল। তাবপব সে হাত্তব মুঠো খুলে টাকাগুলো ওঁব দিকে এগিয়ে ধবে বললো এবাব জমাসেব ভাড়াই বাখুন।

টাকাগুলো হাতে নিয়ে খুব নিখুঁতভাবে গুনলেন হবশংকববাবু, বললেন : আবো তিন মাসেব বাকি বইলো কিন্তু

: হাঁ, সেই কথাই বলছিলুম, জ্যাঠামশাই। এবাব থেকে বসিদটা দিয়ে বাখলে কেমন হয় ?

: বসিদ ?

চোখ কপালে তুললেন হবশংকববাবু। বললেন : তোমাব বাবা বেঁচে থাকতে তো কোনদিন বসিদেব কথা তোলেনি ! আজ হঠাৎ বসিদেব কথা উঠছে কেন ?

: বাবার কথা বাদ দিন। বসিদটা থাকলে আমাদের পক্ষে হিসেব বাখাব একটু সুবিধে হয় কিনা—

নীলু এবাব একটু হাসলো।

: তুমি ধামো বাপু। ক'টা টাকা হিসেব—তোমরা না পারে আমিই রাখবো'খন। এই, কে যাচ্ছিস রে ?

'অদৃশ কাকে দেখে হরশংকরবাবু ডাক দিলেন। যাকে ডাকলেন, তার কাছ থেকে কোনরকম সাড়া না পেয়ে হরশংকরবাবু চেষ্টা করে তন্দ্রাকে ডাকতে লাগলেন : তন্দ্রা, তন্দ্রা—

কিছুক্ষণের মধ্যেই পিঠময় কালোচুল নিয়ে তন্দ্রাদি দরজা জুড়ে দাঁড়ালো।

: নীলুকে একটু চা খাওয়াবিনে তোবা? কোথায় যে সব থাকিস?

নীলু চা খাওয়ার অনিচ্ছা জানিয়ে বলে : পরে আরেকদিন এসে খেয়ে যাবো, জ্যাঠামশাই। আজ আসি—

হরশংকরবাবু হাসতে হাসতে বলেন : আর তো তুমি ওপরে আসোই না। আগে কত আসতে!

হাসতে গিয়ে হরশংকরবাবুর ফল্‌সু দাঁতগুলো বেরিয়ে আসছিল। নীলু মনে মনে বলে, তোমার এই ফল্‌সু দাঁতগুলো যেদিন টেনে খুলে দেব, সেদিন বুঝবে কত জলে কত তেল! আমি বেয়ারার চাকরি করি, তুমি সেদিন গলাবাজি হবে আমার মাকে, ভাইকে, বোনকে জানিয়ে দিয়েছো। যেদিন তোমাকে বাগে পাবো—

নীলু আর দাঁড়ায় না। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে পেছন ফিরে ছাখে, তন্দ্রাদি কখন এসে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়েছে। সিঁড়ির আবহা আলায়ে তন্দ্রাদিকে খুব হুঃসহ মনে হচ্ছিল। সিঁড়ির মাঝামাঝি ধাপে, খুব আলতোভাবে নেমে এসে চাপা গলায় সে বললো : জামার হুকটা লাগিয়ে দেবে না, নীলু?

নীলু কোন কথা না বলে সুস্থভাবে নেমে চলে এলো।

ঘরে ঢুকে নীলু জামা খুলতে খুলতে দেখলো, তার ঘরের কোণগুলোতে মাকড়সার বুলগুলো আর নেই। নিশ্চয়ই কোন সময় মা বা মীনা সাক করে দিয়ে গেছে। জামাটা হাংগাবে বুলিয়ে রাখছিল নীলু। মার ডাক এলো : নীলু কিরেছিস?

নীলু সাড়া দেয় : ফিরেছি। কেন, কিছু বলবে, মা ?

: এ ঘবে আয়—

নীলু ও ঘরে যায়। মা একটা শ্রাণ্ডলুমের জামা তার হাতে দিয়ে হাসতে হাসতে বলেন : সেলাই করলুম, পর তো, ঠিক হয়েছে কিনা দেখি—

নীলুব চোখের কোণছুটোয় খুন জমছিল।

: কেন তুমি আমার জন্মে বানালে, মা ?

মার হাসিমাখা ঠোঁটছুটো হঠাৎ কেঁপে উঠলো : একটা জামায় তুই অফিস কবছিস্, আমি কি দেখতে পাচ্ছি না ?

: কিন্তু মা --

নীলু মাকে একসময় অশ্রুব বাড়িব জামা সেলাই করে দিতে বাবণ কববে ভেবেছিল। এখন সে যা হোক একটা চাকরি করে মাস-কাবাবে কিছু টাকা ঘবে আনছে। দবকাব হয়, সে আরো খাটবে। মিলুব মাখা কেটে গিয়েছিল বলে গতমাসে একটু বেশি খবচ হয়ে গেছে। সব মাসে তো আব তা হবে না। তাছাড়া, পাড়ায় প্রেস্টিজ নিয়ে বাস কবতে হবে। বাবা ছিলেন সরকারী অফিসার। ওকথা ভুললে তো চলবে না। এই জামা সেলাইর ব্যাপাবে হবশংকববাবুই কোনদিন হয়তো তাব মাকে অপমান কবে যাবে।

কিন্তু এসবব কিছু সে বলতে পারলো না। না, সে কোনদিন মাকে ওকথা বলতে পাববে না। মা চিবদিনের মশে তার মুখ বন্ধ কবে দিল। অথচ মাব তৈবী-কবে-দেওয়া জামাটা না নিয়েও সে পারে না।

মাখা নীচু কবে সে জামাটা গায়ে গলায়।

মা দেখছে তাব দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে।

: কেমন হয়েছে, দেখি ! মাখাটা উঁচু কর—

নীলু মাখা উঁচু কবলো। কিন্তু কিছুতেই মার মুখেব দিকে তাকাতে পাবলো না।

মা ডাকলো : মীনা, দেখে যা—

মীনা এলো। দেখলো। বললো : বেশ হয়েছে—

মা বললো : তোর জামা কাল বানিয়ে দেবো, কেমন ?

মীনা মাথা তুলিয়ে বেবিয়ে যায়।

জামা খুলতে খুলতে নীলুর মনে হলো, মা তাকে যেন কিছু বলতে চায়। সে জিজ্ঞাস কবলো : কি মা ?

: শোন—

নীলু মার কাছে এগিয়ে গেল।

: টাকা নিয়েছে বলে ওকে আমি যা বলেছি, বলেছি। তুই আর কিছু বলিস্ না।

নীলু মাথা তুলিয়ে বললো যে, সে মিলুকে কিছু বলবে না।

সেদিন ছিল রোববার। কথা ছিল, সেদিন পীযুষ ওদের সবাইকে সিনেমা দেখাবে। পীযুষের প্রেমের ব্যাপার অনেক দূর গড়িয়েছে। তাই, তার এই জরিমানা। কেউ প্রেম করলে এবং তা জানাজানি হলে সে ওদের আইন মতো এই জরিমানা দিতে বাধ্য। সেই সঙ্গে একটা করে ওম্লেট এবং এক কাপ চা। নীলু তাই তার সমস্ত কথা বেমালুম চেপে গেছে।

পীযুষের ব্যাপাবটা একটু অল্প রকম। দুর্গাপুর থেকে তার কোন এক মাসতুতো বোন পরীক্ষা দিতে এসে কলকাতায় ওদের বাড়িতেই মাস তিনেক ছিল। তারই সঙ্গে প্রেম। পরীক্ষার পর মেয়েটি ওর সঙ্গে চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া, প্ল্যানোটোরিয়াম, দক্ষিণেশ্বর, থিয়েটার, সিনেমা - হেন জায়গা নেই যে যায়নি। যেদিন ভিক্টোরিয়া গিয়েছিল, সেদিন চন্দন আর মান্টু পিছু নিয়ে দেখে এসেছে মেয়েটাকে। খুব নাকি জাঁহাজ মেয়ে। মান্টু বলছিল : পীযুষটা জুটিয়েছে বেশ।

পীযুষের সেই মাসতুতো বোন এখন দুর্গাপুরে চলে গেছে। সেখান থেকে সাড়ে চারপাতার চিঠি লিখেছে পীযুষকে। কী সেই চিঠি রে বাবা! যেন মহাভারত। পড়ে শেষ হয় না। পীযুষটা যেমন বোকা! ও চিঠি কেউ কাউকে দেয়? সে সেরা চিঠিখানা সবাইকে ধরে ধরে পড়িয়েছে।

মান্টু চিঠিখানা পড়ে বলেছিল : এতে এত সব ভারী ভারী কথা আছে, তোর ভাগি ভালো, পীযুষ, পোস্টাফিস থেকে বেয়ারিং চার্জ করেনি।

চন্দন বলেছিল : শুধু কি ভালো ভালো কথা? এমন দারুণ দারুণ সব ব্যাপার আছে, তোর ভাগি ভালো, পিণ্ডনটা খুলে পড়েনি। পড়লে হার্টফেল করতে নির্ধা।

নীলু খুব ভেবে-চিন্তে রায় দিয়েছিল : আমাদের নিয়ম যা

আছে, তা মানতেই হবে। একটুপ সিনেমা, একটা করে গুলেট
আর এক কাপ করে চা।

পীযুষ খুব সফলতার হাসি হেসেছিল।

মাণ্টু তার মুখের সামনে হাত নেড়ে বলেছিল : মালকড়ি
কিছু ছাড় মাইরি, এইবেলা টিকিটটা কেটে নিয়ে আসি।

ঠিক হলো, দেড়টার সময় সবাই এসে শান্তি ঘোষ স্ট্রীটের
মোড়ে দাঁড়াবে। পীযুষ টিকিট কেটে ট্যান্সি নিয়ে আসবে।
সবাইকে নিয়ে যাবে সিনেমার হলে। পীযুষের টাকা আছে।
ও পারে খরচ করতে।

: কোন বইটা দেখবি, বল্--

মাণ্টু তার পিঠ চাপড়ে বলেছিল : আমাদের আবার চয়েস!
যা-যা, যাহোক একটার টিকিট কেটে নিয়ে আয়—হিন্দী বাংলা
ইংরেজি—একটা কিছু হলেই হলো, কি বল্ ?

: তাছাড়া আর কি!

চন্দন সমর্থন জানিয়েছিল। ভারি কি চালে মাথা তুলিয়ে
বলেছিল : তবে ফাস্ট ক্লাসের টিকিট হওয়া চাই। করছি
মাসভুক্ত বোনব সঙ্গে প্রেম। মাসভুক্ত বোন আর নিজে
বোন প্রায় এক। এক্ষেত্রে নো কন্সিডারেশন—

শেষপর্যন্ত সেকেন্ড ক্লাসই যাওয়া হবে, ঠিক হয়েছিল।
কিন্তু পীযুষ আর এলো না। সবাই দেড়টা থেকে সেজে-গুজে এসে
দাঁড়িয়ে আছে। পীযুষের দেখা নেই। পীযুষ যে এভাবে ডোবাবে,
কেউ ভাবতে পারেনি। দুটো বাজলো, আড়াইটে বাজলো, তিনটেও
বাজলো। না, পীযুষ তাহলে সত্যি সত্যিই এলো না।

মন-মেজাজ সবারই তিরিকি হয়ে আছে। একটা মাঝবয়সী
লোক চন্দনকে জিজ্ঞাস করলো : আচ্ছা, জীবনতোষবাবুর বাড়ি
কোথায় বলতে পারো ?

চন্দন বলে দিল : একদম সোজা চলে যান, পরিতোষবাবুর
বাড়ির পাশে।

লোকটা তা-ই বিশ্বাস করে চলে যাচ্ছে দেখে নীলু বললো :
না মশাই, ঠিক জানি না। আপনি সামনে এগিয়ে জিজ্ঞাস ককন।

মাণ্ট, তখনই নীলুব কন্ঠে ধরে টান দিলো। ছাগ, কে তাকে
ডাকছে—

নীলু পেছন ফিরে দেখলো শববী আর বমলাদি। শববী গম্ভীর,
বমলাদি একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসছে। নীলু প্রথমে নিজেই চোখ-
জুটোকে বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি। তাবপব যখন বুকের ভেতর
সেই পুরানো নালশিখাটা বি বি করে ছলে উঠলো, তখন সে
আঠালো গলায় চন্দন আর মাণ্টকে বললো : আমি আজ
আসছি বে—

মাণ্ট, অত্মদিকে মুখ ফিরিয়ে বললো : আমবা কি তাতলে
তুজনে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাল্লুষের মাংস খুনবো ?

চন্দন ফুৎ এগিয়ে এসে চাপা গলায় বললো : কিছু মালকডি
দিয়ে যা মাইবি, শুধু শুধু আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি বল ? একটা
করে সিংগ্রেট অম্বত। অফটার অল, আমবা হিউম্যান বিয়ি
তে. ১।।

নীলু পকেট থেকে দশটা পয়সা বের করে ওর হাতে দেয়। খুচবা
পয়সাগুলোই দিয়ে তাকিয়ে মেয়েজুটো যাতে খুনতে না পায়,
এমনভাবে ৫ ফিস্ ফিস্ করে বললো : বললম বলে, দশ. পয়সাই
দিলি, ১।।। ওর বিবক বলে কি কিছু নেই .ব. শালা :

মাণ্ট, আরো কী সব বলছিল। নীলুব কানে যায়নি। সে
ততক্ষণে শববীকে পাশে নিয়ে চলতে শুরু করেছে।

বমলাদি হাসতে হাসতে বললো : দিলুম তো আড্ডাটা ভেঙে :

আড্ডা এমনতেই ভেঙে গিয়েছিল। নীলু বললো : তাবপব,
এদিকে আজ কি ভেবে ?

শববী কোনাকুনি নীলুব দিকে তাকালো। মোটজুটো তাব পাথরের
মতো শক্ত। যেন একটা ছুর্ভেজ বাগ তাব মনের ভেতর ধিকিধিকি
ছলছে। সেই বাগে সে তাকে যেন পুড়িয়ে মাবতে চাইছে।

কিন্তু নীলু তার রাগের কোন কারণ খুঁজে পায় না। সে এতদিন ওদেব বাড়ি ষায়নি, সেইটে কি তার অপরাধ? কিন্তু সেদিনের অভিজ্ঞতার পর শবরীদের পাড়ায় যাওয়া তার পক্ষে কি আর সম্ভব? শবরীর অন্তত সেকথা বোঝা উচিত। নাকি সেদিন রমলাদির সঙ্গে নীলু গঙ্গাব ধাবে বেড়াতে গিয়েছিল, সেকথা শবরী জানতে পেরাছে? কিন্তু শবরী সেকথা জানেনই বা কি কবে? তবে কি বমলাদি একে সেকথা বলে দিয়েছে?

রমলাদি বললো : এ পাড়ায় এসেছিলুম একটা দবকাবে। গলির মুখে দাঁড়িয়ে তুমি গল্প কবছো, শবরী দেখতে পেয়েছে।

শবরীর কঠিন চোখছুটো এবার বমলাদির মুখে নিবন্ধ হলো।

বমলাদি বললো : সাংঘাতিক তোমাব চোখ, শবরী। হাজার মাল্লুষেব ভিডে কোথায় কোন গলিব ভেতব ও ওব বন্ধুদেব সঙ্গে গল্প কবছে, তোমাব চোখ ঠিক তাকে খুঁজে বেব কবছে। আমি তো মরে গেলেও পাবতুম না।

এবার শবরীব চোখছুটো বমলাদিকে দগ্ন কবতে চাইছে।

: বললুম, ও ওব বন্ধুদেব সঙ্গে গল্প কবছে, চলো, চলে যাই।

শবরী বললো : ভালো হাচ্ছ না কিন্তু, বমলাদি-

শবরীব ধমকে কোন কাজ হলো না। বমলাদি হাসতে হাসতে বলে চললো : শবরী বললো, নীলিমকে ডাকো হো, বমলাদি। ওব সঙ্গে আমাব একটা কথা আছে। বললুম, তোমাব সাথে কথা আছে, তুমি ডাকো। আমাকে কেন ডাডাচ্ছো তোমাদেব মধ্যে?

শবরী এবার ফেটে পড়লো : আমি ডাকতে বলেছি, না তুমি ডাকতে বলেছো? তুমি তো রমলাদি আমায় বললে, নীলিমকে ডাকো। কথা আছে ওর সঙ্গে। এত মিথ্যেকথা বলতে পাবো বমলাদি, সত্যি—

শবরীব কথায় বমলাদি খুব হাসছিল। তাতে শবরী যে আবেগ চটে যাচ্ছিল, তার চোখ-মুখে তা অত্যন্ত স্পষ্ট। নীলু হাসতে

হাসতে বলে : থাক্ । বাস্তব মাঝখানে এই দুর্লভ বস্তুটিকে নিয়ে
অগড়া নাই বা করলে ।

শববীর বাগ পড়ে না । বমলাদি তাব পিঠে হাত বুলাতে
বুলাতে বলে : জানিস্ তো ভাই, তোর বমলাদি একটু বাজে বকে ।
তাব ওপব বাগ করতে আছে । ছিঃ—

শববী কোন কথা বললো না । মুখখানা তাব আগের মতোই
কঠিন ।

নীলু প্রসঙ্গটাকে একটু হালকা করে দেবাব জান্তে বলে :
বমলাদি, আপনাদের কাছে

• ঠাা, গুঁকজনের সঙ্গে এইভাবে একটু ভীক্তশ্রদ্ধা নিয়ে
কথা বলবে ।

বমলাদির কথায় তাকে একটু থামতে হলো । তাবপব হেসে
বললো : আমাব একটা খাওয়া পাওনা আছে

• কিনেই বলে তে, ৷

বমলাদি কপাল কঁচকাইলো ।

• বেজার্টের পাস করবেন, খাওয়াবেন না ৷

বমলাদি হেসে উঠলো । শববীকে বললো : তাহলে একদিন
নীলিমকে খাওয়াবাব ব্যবস্থা করা যাক । কি বলে ৷

শববীর মুখখানা তেমনি কঠিন হয়েই বঠলো

পাঁচমাখাব মোড়ে ওবা একটা ট্রামে উঠলো । ববাবের
বিকেস । তাই ভিডটা একটু কম । পাশাপাশি গোটা-দুই স্লেডিঞ্জ
সিট্ খালি ছিল । শববীকে পাশে নিয়ে বমলাদি বসতে যাচ্ছিল ।
কি ভেবে বমলাদি নীলুকে শববীর পাশে দিয়ে নিজে একদম
ওদিকের সিট্‌টায় বসে পড়লো । শববী বমলাদির দিকে কোনাে নি
তাকালো । অন্তরূপ হাসি দিয়ে বমলাদি বাগ খুলে পয়সা বন
করে টিকিট কাটলো ।

নীলুব আজ আবার বহুদিন পরে দ্বিতীয় দিনগুলোব ১২৭
মনে পড়লো । চাপা গলায় সে বললো • মনে হচ্ছে, আমবা

বুঝি সেই দিল্লীতেই আছি। শবরী তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলো। নীলু জিজ্ঞেস করলো : আজ তোমার কি হয়েছে, বলো তো ? তখন থেকে দেখছি, তুমি কেমন যেন সবার ওপরে রেগে আছো।

শবরী এবারেও কোন কথা বললো না। রোদ থেকে চোখ বাঁচাবার মতো কপালে হাতের তালু রেখে শবরী বসে থাকে। নীলু জানালায় ভেতর দিয়ে কলকাতা শহরকে তাকিয়ে দেখে। এক জায়গায় ট্রাম-লাইন খুঁড়ে ফেলে রাখায় লোহার কংকালের ওপর দিয়ে ট্রাম চলেছে। গাড়ি, মানুষ, ফুটপাথের ফলের দোকান -সব একাকার হয়ে গেছে। নীলু শবরীর মনটাকে ওদিকে ফেরাবার জন্তে বলে : কলকাতাকে ফাঁসিয়ে ওরা দিল্লীকে বাঁচিয়ে রেখেছে বেশ।

মন না ফেরাক, শবরী মুখটা তো তুলবে! শবরী মুখ তুললো না। যদিও ওর মুখে রোদ পড়ছিল না, তবু রোদ থেকে চোখ ঢেকে রাখে সে।

কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ ট্রাম বন্ধ হয়ে গেল। লোকেরা ছড়মুড় করে নেমে পড়ছে। নীলু ব্যাপারটা কি বুঝবার জন্তে শবরীর পিঠের ওপর দিয়ে জানালায় টুকি মেবে সামনে পর পর বেশ কয়েকটা ট্রামের ট্রলিকে অনড় ঝুলে থাকতে দেখতে পেল। ছপাশে রাস্তা জ্যাম্ করে অজস্র গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে। তাদের মধ্যে কতকগুলো ডবল ডেকার বাসও রয়েছে।

দেখতে দেখতে ওদের ট্রাম একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। নীলু উঠে গিয়ে ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে দেখলো, সামনে একটি বিরাট মিছিল চলেছে। দীর্ঘ মিছিল। চলেছে তো চলেইছে। কখন শেষ হবে, বলা যায় না।

নীলু ফিরে এলো।

: কি করবেন রমলাদি, সঙ্কর আগে তো এ মিছিল শেষ হবার নয়!

রমলাদি রুমাল দিয়ে মুখেদ ঘান মুছতে মুছতে বলে : এসুপ্প'নেড্, এখান থেকে খুব দূর নয়। চलो, তেঁটেই চলে বাই—

শবরীর কি হয়েছে নীলুকে ইশারায় সে জিজ্ঞাস করলো। নীলুও ইশারায় জবাব দিল, সে কিছুই জানে না। রমলাদি শবরীর পাশে গিয়ে বসে পড়লো। খুব আদর করে তার পিঠের ওপর হাতখানা রাখলো।

: শবরী, চलो, এখানে নামা যাক্ -

শবরী মাথা সোজা করে বসলো। বড় একটা শ্বাস নিয়ে সে বললো : আমি হাঁটতে পারবো না, রমলাদি। মাথাটা ভীষণ টলছে।

: আমাকে ধবেও পাববে না? তাছাড়া নীলিমও তো বয়েছে—

শবরী আবার হাতের তালুতে কপালটা চেপে ধবে রইলো।

রমলাদি শবরীর পাশে বসে তার কপালে ওর নবম হাতখানা বুলিয়ে দিচ্ছে। পেছনের একটা সিটে নীলু চুপচাপ বসে রইলো।

যে ক'টা দিন ওরা দিল্লীতে ছিল, কারো শরীর খারাপ হয়নি। ঐ ক'টা দিনে একবারও কি তার কিংবা শবরীর শরীর খারাপ হতে পাবলো না? নীলুর শরীর খুব একটা মজবুত না হলেও অসুখ-বিসুখ বড় একটা করে না। পেটের অসুখ তো জ্ঞানত তার হয়নি। জ্বর-জ্বালার কথাও প্রায় প্রশ্নই ওঠে না। কোনরকম অসুখ হয় না বলে তার মনে খুব চুখ। অসুখ হয় না তার। কিন্তু তার বৃকের ভেতবে একটা চিরকোলে অসুখ পোষা আছে। সে তা গোপন অসুখ—একবারে তার নিজস্ব। বৃকের ভেতবের সেই অদৃশ্য নীল-শিখা, যা ভীষণ সংকট মুহুর্তে তার বি বি করে জ্বলে। সঙ্গে সঙ্গে ডালপালায় ছড়িয়ে পড়ে তার নীল আক্রোশ। গলায় একটা আঠালো বিশ্বাদ পলিমাটির মতো জমতে থাকে। সেই সঙ্গে একটা জ্বজ্ববে ঘামে তার হাতের তালুছটো ভিজে ওঠে।

দিল্লীতে শবরীর শরীরটা কি একবার খারাপ হলে পাবতো না? তাহলে নীলু নিজেকে শবরীর কাছে আরো স্কাবী প্রমাণ করতে পারতো। বেশি কিছু না হোক, এই আজকের মতো মাথা টলে

যাওয়া, কিংবা একটু মাথা ধরা—তাহলে নিজে রাত জেগে হোটেলের
তার একটু মাথা টিপে দিতে পারতো। এই তো আজ এখানে হলো,
দিল্লীতে হলে কি ক্ষতি হতো ?

রমলাদি তার একটা হাত ছড়িয়ে দিয়ে শবরীকে বললো : তুমি
আমার এই হাতের ওপর হেলান দিয়ে বসো, শবরী—

শবরী তাই করলো। চারদিকে হৈ-হট্টগোল। শবরীর নিশ্চয়ই
ভালো লাগছে না। এখন নীলুর কি করা উচিত, সে ঠিক করে উঠতে
পারছে না।

কিছুক্ষণ পরে ট্রামের চাকা ঘুরলো। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় কবে
কতগুলো লোক লাফিয়ে ট্রামে উঠে এলো। ট্রামের ভেতরটা আবার
সবব হয়ে উঠলো।

এসম্মানেতে শবরী রমলাদির কাঁধে হাত রেখে ট্রাম থেকে
নামলো। রমলাদির একটা হাত শবরীর কোমবে জড়িয়ে নিয়েছে।
কয়েক পা এগোতেই দেখা গেল, ওদিক থেকে দলে দলে লোক
এদিকে উর্ধ্বাঙ্গে ছুটে আসছে। মিছিলের ওপর বোমা পড়েছে ;
কেউ কেউ বলছে, গুলিও চলেছে। বোধহয় কিছু দূরে পব পব
কয়েকটা বোমা ফাটলো, না কি ওগুলো গুলির শব্দ, নীলু ঠিক বুঝে
উঠতে পারলো না। আজকাল হামেশাই ও রকম শব্দ শোনা যায়।

নীলু অল্প পাশ থেকে তার একখানা হাত শবরীর কোমবে
জড়িয়ে গুলির মতো ঢুকে পড়লো। গুলির ভেতরেও কিছু লোক
ছোট্ট ছুটি করছে। এই মুহুর্তে কি করা দরকার, নীলু ঠিক বুঝে
উঠতে পারছে না। রমলাদির কপালে স্পষ্টত দুশ্চিন্তার বোঝা।

শবরী বলছে : আমি আর ঠাঁটতে পারছি না। আমাকে তোমরা
একটু দম নিতে দাও।

রমলাদি বললো : ' আর একটু এগিয়ে গেলেই সুবিনয়বাবুর
চেয়ার।

ভয় ছিল, এ সময়ে সুবিনয়বান্দকে পাওয়া যাবে কিনা ! এবং তাঁর চেম্বারের দরজা খোলা থাকবে কিনা !

গলির আলোগুলো হঠাৎ এক সময়ে নিভে গেল। কয়েকটি হেলে বোমা এবং পাইপ গান হাতে ওদের পাশ দিয়ে ছুটে গেল। তার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই গলির মুখে পর পর কয়েকটা বোমা ফাটলো। শবরী ঠিকমতো হাঁটতে পারছিল না। শাড়ির পাড় তার ছুপায়ে আটকে যাচ্ছিল। এরকম বিশ্রী এক পরিস্থিতিতে নীলু কখনো পড়েনি। শবরী অশুস্থ হলো, কিন্তু এমন একটা দিনে এবং এমন একটা জায়গায় যে, রমলাদিকে এবং তাকে দুজনকেই বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হলো। গন্ধকের গন্ধ নাকে এসে লাগছে। চোখও জ্বালা কবড়ে, কি জানি, পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ফাঁড়েছে কিনা !

একটা কোলাপ্‌সিব্‌ল গেটের সামনে এসে রমলাদি বললো :
গেটও তো বন্ধ দেখছি !

শবরীকে পুবোপুরি নীলুর হাতে ভেড়ে দিয়ে রমলাদি গেটের সামনের সিঁড়ির ওপর উঠে কলিংবেলের চাবি টিপলো। দারোয়ান বেরিয়ে এসে জানালো, এখন গেট খোলা হবে না ; সাহেবের কড়া হুকুম।

রমলাদি হুকুম দিল : সাহেবকো বোলাও—

দারোয়ান খুব অনিচ্ছায় সাহেবকে বোলাতে গেল। সাহেব নিচে নামলেন না। ওপরের একটা জানালা একটু ফঁক করে জিজ্ঞেস করলেন : কে ?

: আমি রমলা।

সেই ছুটি শব্দেই প্রায় ম্যাজিকের মতো কাজ হলো। বিগলিত হাসি নিয়ে দারোয়ান এসে গেট খুলে দিল। নীলু ও রমলাদি

শবরীকে ধরাধরি করে ওপরে নিয়ে গেল। সামনেই সুবিনয়বাবু।
দীর্ঘ সুপুরুষ চেহারা। বয়েস চল্লিশের মতো হবে। যদি সামান্য
বেশিই হয়, তা তাঁর সিন্ধুর পাঞ্জাবিতে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল।
গালদাড়ি মসৃণভাবে কামানো। গায়ের রঙের সঙ্গে সিন্ধুর
পাঞ্জাবির রঙ নিখুঁতভাবে মিশে গিয়ে একাকার।

: কি হয়েছে ওর ?

: হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে একটু।

উত্তর দিল রমলাদি।

: আশ্চর্য! ঠিক এই সময়েই অসুস্থ হলো? আগে থেকে
শরীরটা ঠিক ছিল না বোধহয় ?

: তা-ই হবে।

নীলু দেখলো, ভাঙ্গলোকের কপালে কোন রেখা ফুটে উঠলে
তা দেখা যায় না। শুধু কয়েক সেকেন্ডে উনি বনলাদির মুখের দিকে
নির্বিরোধ চেয়ে রইলেন।

: ঠিক আছে। বাহাজুর—

চাবির বিং হাতে একটি নেপালী ছোকরা এসে দাঁড়ালো।

: পাঁচ নম্বর কেবিনটা খুলে লাইট আন পাখা চালিয়ে দিয়ে
এসো।

বাহাজুর চাবির বিং ঘোরাতে ঘোবাতে চললো পাঁচ নম্বর
কেবিনের দিকে।

সুবিনয়বাবু বললেন : তোমরা ওকে নিয়ে ওর সঙ্গে যাও।

বাহাজুর পাঁচ নম্বর কেবিনের দরজা খুলে আলো এবং পাখা
চালিয়ে দিয়ে বাইরে এলো।

: যাইয়ে -

ধবধবে সুন্দর বিছানা দেখে শবরী 'ওব ওপর বসতে না বসতেই
গা এলিয়ে দিল। এটুকু পথ হেঁটে আসতে তার যে বেশ কষ্ট হয়েছে,
এখন তা ভালোভাবেই বোঝা গেল। মুখে ঘাম জব্ জব্ করছে,
কপালের ওপরে চুল এলোমেলো উড়ছে, গায়ের শাড়ি ভীষণ

অবিজ্ঞস্ত। হাত দিয়ে কপালের চুল সরাতে সরাতে শবরী খুব
অস্বচ্ছভাবে বললো : আমাকে একটু জল দেবে, রমলাদি ?

রমলাদির আগেই নীলু ঘরের কোণে একটা কুঁজো ও গেলাস
আবিষ্কার করে জল গড়িয়ে শবরীর হাতে দিল। শবরী জল খেয়ে
সুস্থিরে গুলো।

রমলাদি একটা টুল টেনে নিয়ে তাতে বসে তার চুলের ভেতর
আঙুল চালাতে চালাতে বললো : টেলিফোনে তোমার বাড়িতে
একটা খবর দিই, কি বলো শবরী ?

: না না—শবরী ব্যস্তভাবে বলে : ও কাজটি করো না। তাহলে
বাড়িতে সবাই ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠবে।

: কিন্তু এরপর তোমার শরীরটা যদি আরো খারাপ হয়— ?

রমলাদির স্মৃতিস্তিত প্রশ্ন।

: না। হ্যাঁ আব হবে না। একটু রেস্ট নিলেই ঠিক হয়ে
যাবে। তারপরে একটা ট্যাক্সি করে চলে যাবো সবাই মিলে।

শবরী কথা বলতেই হাঁপিয়ে উঠছিল। একটু দম নিয়ে
বললো : নীলিমও যাবে। কি, যাবে না তুমি ?

নীলু বলে : কেন যাবো না ? কিন্তু এ অবস্থায় ট্যাক্সি পাওয়া
যাবে তো ?

শবরী রমলাদির মুখের দিকে তাকালো। রমলাদি ঝুঁক কৌচ-
কালো। বললো : সেও তো এক চিন্তা। কখন যে গোলমাল
ধামবে, কে জানে !

চাবির রিং ঘোরাতে ঘোরাতে নেপালী ছোকরাটি এসে বললো :
মেমসাহেব কো সাহেব বোলাতা হয়—

রমলাদির যাবার কোন ব্যস্ততা দেখা গেল না। বাহাছর চলে
গেল। তার চাবির রিং ঘোরাবার শব্দও আব্ছা হয়ে মিলিয়ে গেল।

: একটু আসছি, এঁ্যা ?

শবরীর চোখ বন্ধ। সে মাথা নেড়ে বললো : এসো—

'আসছি' বলেও রমলাদি সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল না। সে

পাখাটার দিকে তাকালো। ভুরু কঁচকালো। তারপর রেগুলে-
টারে পাখার স্পীড বাড়িয়ে দিল। স্পীডটা কতখানি বাড়লো,
সেঁতা দেখলো। তারপর আবার বললো : আসছি

কিছুদূর গিয়ে রমলা ফিরে এলো। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নিচু
গলায় বলে গেল : দরজাটা বন্ধ করে দিয়ো না যেন !

নীলু ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে চারদিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে
লাগলো। হাসপাতালের কেবিনের মতো ঘরখানা বেশ ছোট। এক
পাশে একটা খাট। তাতে হাসপাতালের মতো সাদা ধবধবে
বিছানা পাতা। অন্য পাশে একটা ডেসিং টেব্লে স্নো, পাউডার,
চিক্রনি সাজানো। এক কোণে একটা কুঁজো, একটা কাচের
গেলাস তার মুখে উবুড় করা। ওপরে ব্রাকেটে একখানা টার্কিস্
টাওয়াল।

নীলু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলো, উল্টো দিকে একটা দরজা।
দরজাটা খিল-দেওয়া। নীলু জানে না, ওপাশে কি আছে। সে বুকে
উঠতে পারে না, এটা হোটেল, না হাসপাতাল।

বাইরে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল। শবরী চোখ খুলে
তাকালো। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে, সম্ভবত অবাঙালীই,
গল্প করতে করতে চলে গেল। দরজার পর্দা সরানো ছিল। তাই
ষাবার সময় ওদের কোতূহলী চোখ একবার উঁকি মেয়ে যায়।

শবরী বলে : নীলিম, পর্দাটা টেনে দাও।

নীলু পর্দা টেনে দেয়। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে শবরীকে
ছাখে। মুখের ওপর শুকনো চুল উড়ে পড়ছে, বৃকের ওপর
শাড়ি ভীষণ অবিশৃঙ্খল। এখন আবার তার বৃকের নিচে সেই
নীল শিখাটা উঁকি মারতে চাইছে। না, সে ওটাকে এখন
কিছুতেই জলতে দেবে না। তবু তার গলার ভেতরটা আঠালো
ঠেকছে, হাতের তালুতে নির্বোধ ঘাম।

: দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? এসো, বসো !

নীলু টুলে বসলো। আয়নায় শবরীর মুখ আর দেখা যাবে না।

আয়না জুড়ে নীলুর পিঠখানা ভাসছে। আয়না থেকে সে তার পিঠখানা সরিয়ে নিল।

শবরীর কপালের ওপর শুকনো চুলগুলো পাখার হাওয়ার উড়ে পড়ছিল। নীলু ধীরে ধীরে চুলগুলো সরিয়ে দেয়। তারপর কপালের ওপর হাতখানা নেমে আসে। কপালের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে নীলু বলে : দিল্লীতে ক'দিন তুমি তো বেশ ভালোই ছিলে, শবরী—

দিল্লীর কথা শবরীর মনে পড়লো কিনা কে জানে, শবরী কপালের ওপর নীলুর হাতটা চেপে ধরলো।

: আজ আমি জীবনের সবচেয়ে বড় ছুঃখ পেয়েছি, নীলিম—

শবরীর চোখের কোণে মুন জমছিল।

নীলু তার চুলের ভেতর দিয়ে আঙুল চালাতে থাকে। ছচোখ বন্ধ হয়ে আসে শবরীর। 'ছুঃখ' শব্দটিতে নীলু চমকে ওঠে। সে জানে, পৃথিবীতে সে-ই একমাত্র ছুঃখী। তার এই সাতাশ বছরের জীবনে কেবল ছুঃখ ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু শবরীর জীবনেও ছুঃখ আছে, আজ সে জীবনের সবচেয়ে বড় ছুঃখ পেয়েছে, ভাবতে তার আনন্দ হচ্ছিল, তেমনি আবার অবাকও লাগছিল।

তুমি ছুঃখের কতটুকু জানো শবরী? আমার ছুঃখের কানাকড়িও যদি তোমার জানা থাকতো—

একটা বড়ো দম টেনে নিতে নিতে শবরী বলে : আজ বড়ো ছুঃখ পেয়েছি আমি—

নীলু একটু ঝুঁকে পড়ে। জিজ্ঞেস করে : আমি কি তোমাকে কোন ছুঃখ দিয়েছি, শবরী?

: তুমি - ?

শবরীর একটি হাত নীলুর হাত বেয়ে কাঁধে, পরে কাঁধ বেয়ে ঘাড়ের ওপর উঠে এসে স্থির হলো। নীলুর মুখটাকে খুব কাছে টেনে আনলো সে। হঠাৎ—ছি ছি, কেউ যদি দেখতে পেতো, যদি রমলাদি ঠিক এই মুহূর্তে এসে পড়তো।

: জানি, তুমি আমাকে কোনদিন দুঃখ দেবে না ।

নীলুর সমস্ত শরীরটা কেমন যেন বধির হয়ে গিয়েছিল । সেই বধিরতার ভেতর দিয়ে একটা আগুনের নীলঘোড়া ভীষণ এলোমেলোভাবে ছোট্টাছুটি করছে । দম বন্ধ করে সে সেই ঘোড়াটাকে বৃথাই থামাতে চেষ্টা করছে । গলায় আঠালো বিষ, হাতের তালুতে সেই দুর্বোধ্য ঘাম ।

শবরী, তুমি দিল্লীতে এরকমভাবে একবার অসুস্থ হলে না কেন ? তুমি অসুস্থ হয়ে শুয়ে থাকতে, আমি তোমার কপাল টিপে দিতুম, মাথার চুলে খুব আন্তে আঙুল চালিয়ে তোমাকে আরাম দিতুম । শবরী, জানো, আমি যা ভাবি বা আমি যা চাই, কোনদিন তা হয় না । শবরী, আমার মতো দুঃখী কেউ নেই ।

শবরী বলে : আজ রাত্তিরে গোলমাল না থামলে বেশ হয়, কি বলো ?

নীলু বললো : সত্যি, আজ রাত্তিরে যদি গোলমাল না থামে—

: না-ই বা থামলো ! আমরা তো আর জলে পড়ে নেই— ।

নীলুর আঙুলগুলো শবরীর চুলের ভেতর খেলা করতে করতে হঠাৎ থেমে গেল ।

: তোমার মা, কবরী, কাকু—এঁরা ভাববেন না ?

: কোন করে জানিয়ে দিলে হবে যে, আমি রমলাদির ওখানে আটকিয়ে গিয়েছি ।

একটু থেমে শবরী বললো : তোমার খুব অসুবিধে হবে, না ? কী-ই বা অসুবিধে হবে ? দিল্লীতে একটা ঘরে চারদিন কাটিয়ে আসতে পাবলুম, এখানে একটা রাত্তির—

শবরী দেখলো, নীলু তার কথা শুনছে না । অশ্রমনস্কভাবে কি ভাবছে ।

: কি অত ভাবছো, নীলিম ?

নীলুর জবাব দেবার আগেই সে বলে : ছাখো তে এই দরজাটা কিসের ?

: খুলবো ?

: খোলই না !

হঠাৎ নীলু বিশ্বস্ত ভঙ্গিতে ঝুঁকে পড়ে শবরীর ওপর। শবরী চোখ বন্ধ করে। নীলু তাকায় এদিক-ওদিক। জিপ্সেস করে : আচ্ছা শবরী, এটা তোমার কি মনে হচ্ছে ? হোটেল, না হাসপাতাল ?

শবরী একটু ভাবলো।

: হোটেলের মতোই তো মনে হচ্ছে।

: আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু—

: কি ?

: ওপাশে যদি কোন রুম হয় ?

সামনে বারান্দায় কার যেন পায়ের শব্দ শোনা গেল ! ওরা ভেবেছিল, রমলাদি আসছে। তাই নীলু টুল থেকে উঠে গিয়ে দরজার নামনে দাঁড়ালো। না, রমলাদি নয়। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে হেঁটে গেল। রমলাদি তাহলে এতক্ষণ কোথায় গেল ?

নীলু ছুট করে গিয়ে পেছনের দিকের দরজাটা খুলে ফেললো। অন্ধকার। দরজার পাশেই একটা সুইচ। সুইচ টেপার সঙ্গে সঙ্গে আলোয় দেখা গেল পরিষ্কার একটা বাথরুম।

: শবরী, এপাশে বাথরুম।

শবরীও পাশ ফিরে একটা অ্যাস্-ট্রে আবিষ্কার করেছে। বলে : হোটেলই হবে। এই ছাখে একটা অ্যাস্-ট্রে। আর এতে কয়েকটা সিগ্রেটের টুকরোও রয়েছে দেখছি !

নীলু লক্ষ্য করে, চারদিকে কেমন যেন একটা চাপা গোপনতা :

বলে : কিন্তু কেমন যেন সব। তাই না ?

: কেমন আবার ?

শবরী উঠে এসে বসলো। নীলু বললো : শবরী, তুমি বাথরুমে গিয়ে চোখে-মুখে একটু ভালো করে জল দিয়ে এসো দেখি। তাহলে তোমাকে খানিকটা ফ্রেশ লাগবে।

শবরী উঠে দাঁড়ালো ।

: তোমাকে ধরবো একটু ?

শবরী হাসলো । বললো : না, থাক্ । একাই যেতে পারবো—

শবরী আন্তে আন্তে বাথরুমে গেল । চোখে-মুখে জল দিল ।

তারপর চোখ-মুখ মুছতে মুছতে ফিরে এলো । আয়নার সামনে পেকে চিরুনিটা তুলে নিয়ে চুলে বুলিয়ে নিল । বিহুনি খুললো, বিলি কাটলো, আমার বিহুনি করতে লাগলো ।

: শবরী ?

: উ—

: তোমাকে রমলাদি কিছু বলেছে ?

শবরী মুখ নিচু করলো । জিজ্ঞেস করলো : কি নিয়ে ?

: আমার সম্বন্ধে ?

: তোমার সম্বন্ধে ? কেন ?

: না, মানে, এমনি জিজ্ঞেস করছি, আর কি ?

শবরী আয়না থেকে ঘুরে নীলুর মুখোমুখি দাঁড়ালো ।

: তোমাকে বলতে হবে, এর মধ্যে রমলাদির সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল কিনা !

নীলু কপাল কুঁচকিয়ে বললো : না, না তো !

: মিথ্যে কথা !

: বিশ্বাস করো !

রমলাদিই বলেছে, এর মধ্যে তোমার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছে ।

নীলু আর কোন কথাই বলতেই পারলো না । নিজেকে তার ভীষণ অপ্রস্তুত মনে হচ্ছে । রমলাদি তাকে বলতে বারণ করে নিজেই শেষে শবরীকে বলে দিয়েছে ?

‘আসছি’ বলে রমলাদি সেই যে বেরিয়ে গেছে, এখনো তার দেখা নেই । শবরী অসুস্থ, তা ভালোভাবে জেনেও রমলাদি কোথায়

নিশ্চিন্ত হয়ে বলে আছে। এখন সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে বিক্রী
ঠেকছে। হোটেল, না এটা কি—সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।
তাছাড়া রমলাদি শবরীকে তার দেখা হওয়ার কথা বলে দিয়ে তাকে
একেবারে ডুবিয়ে দিয়েছে।

নীলু আর শবরীর সামনে দাঁড়াতে পারছে না। তার চোখে
চোখ তুলে ধরতে গেলে নিজেকে তার ভীষণ অসহায় মনে হচ্ছে।
এখনই রমলাদির সঙ্গে দেখা হওয়া তার দরকার।

বিকেল থেকে আজ দিনটা তার অতি বাজে কেটেছে। পীযুষ
সিনেমা দেখাবে বলে ফাঁকি দিয়েছে। তারপর শাস্তি ঘোষ স্ট্রীটের
মোড়ে শবরীর সঙ্গে তার দেখা হয়ে যাবে আজ, সেকথা সে স্বপ্নেও
ভাবতে পারেনি। শুধু শবরী নয়, শবরীর সঙ্গে আবার রমলাদি।
এরপর চন্দন, মাণ্টু তাকে আর রেহাই দেবে না। পীযুষকেও ওরা
দলে পেয়ে যাবে।

কিন্তু এদেব সঙ্গে দেখা না হওয়াই বুঝি ছিল ভালো। নীলুর
সঙ্গে দেখা হওয়ার পর শবরী আর বমলাদির মধ্যে বেশ একচোট
কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। তারপর শবরীর শরীর খারাপ হয়েছে।
মাঝপথে ট্রাম বন্ধ। ট্রাম যদিও বা চললো, এস্প্রান্ডে এসে তারা
পড়লো এক সাংঘাতিক গোলমালের মধ্যে। শবরী সেরে উঠেছে,
কিন্তু রমলাদির জন্মে সে শবরীর কাছে ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে
আছে।

এদিকে রাত বাড়ছে। এবপর তার জন্মে মা ভাবে। নীলু
না ফিরলে সে খাবে না, হয়তো মীনাও খাবে না। জামা সেলাই
করার ফাঁকে মা কান পেতে নীলুর পায়ের শব্দ শোনার চেষ্টা
করবে। শুনতে না পেলে মীনাকে ডাকবে। জিজ্ঞেস করবে :
ক'টা বাজলো রে মীনা? নীলু কখন ফিরবে, তোকে কিছু বলে
গিয়েছে?

বাড়ির কথা মনে পড়ায় নীলু একটু ব্যস্ত হয়ে ওঠে। মা
পরের বাড়ির জামা সেলাই করে পয়সা নেয়, মীনার একটা

তানপুরো দূরের কথা, পরার জামা হয় না। সে একটা প্রাইভেট ফার্মে এল. এস. স্টাফ। বড় গরীব তারা। বাবা মারা যাবার পর থেকে তারা ভীষণ গরীব হয়ে গেছে।

: তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে রমলাদির সঙ্গে দেখা করেছো, বলো, করোনি ?

নীলুর জিভে কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে। বলে: ঠিক আছে, আমি তাহলে রমলাদিকে ডেকে আনছি। তুমি আমার সামনে ওকে জিজ্ঞেস করো।

নীলু ঘর থেকে বেরিয়ে কোথাও রমলাদিকে দেখতে পেল না। যেখানে সুবিনয়বাবু বসেন, সেখানকার চেয়ারগুলো ফাঁকা। ছোকরা বাহাছুরের দেখা নেই। নীলু কি করবে, ভেবে পেল না। ছুঁ একবার করিডোরে পাগলের মতো পায়চারি করলো। এটা যদি হোটেলই হয়, সব এমন নিশ্চুপ কেন? একটা চাপা রহস্যময় গুঞ্জন তার কানে ভেসে আসছে। তার ভেতর থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠলো বাহাছুরের চাবির রিঙের শব্দ। ওটা ধীরে ধীরে আরো স্পষ্ট হচ্ছে। নেপাল-নন্দন তার পাশ দিয়ে চাবির রিং ঘোরাতে ঘোরাতে চলে গেল। সেও রমলাদির কোন হদিশ দিতে পারলো না।

নীলু পাঁচ নম্বর কেবিনের দিকে পা বাড়ালো। কি জানি আজ রাস্তিরে তাদের এখানে থাকতে হবে কিনা! হঠাৎ পেছন দিক থেকে কাদের পায়ের শব্দে সে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। সুবিনয়বাবু সিগারেট টানতে টানতে আসছেন। পেছনে রমলাদি। রমলাদির হাতেও একটা জ্বলন্ত সিগারেট।

: এবার তো বেরোতে হয় রমলাদি! গোলমাল থেমেছে ?

রমলাদি সিগারেটে টান দিয়ে বললো : কেন ? বাড়ির জন্তে মন কেমন করছে ?

তারপর হেসে বললো : একেবারে বালক।

নীলু ম্লান একটু হাসলো। সুবিনয়বাবু ফিরে দাঁড়িয়ে তার

দিকে চোখ ছোট করে তাকালেন। ঠোঁটের ওপর একটা অচেষ্টাকৃত আলতো হাসি ভেসে উঠলো।

: এ গোলমাল খামতে একটু সময় নেবে।

নীলু একদৃষ্টে রমলাদির দিকে, তার হাতের সিগারেটের দিকে চেয়ে রইলো। তার চোখে কিছুটা বিস্ময়, কিছুটা কৌতুক। রমলাদি সিগারেট খায়? সে এর আগে একজন মাত্র মেয়েমানুষকে সিগারেট খেতে দেখেছিল। সেও বাঙালী নন। দিল্লী যাওয়ার দিন হাওড়ার প্ল্যাটফর্মে একটা অবাঙালী মেয়েমানুষ তার আদমির পাশে বসে বিড়ি খাচ্ছিল। দৃশ্যটা যতই উপভোগ্য হোক, তার একটা অস্বস্তিকর দিক ছিল। নীলু সেদিকে বেশিক্ষণ তাকাতে পারেনি।

রমলাদি খুব নিপুণ ভঙ্গিতে সিগারেটের ছাই ঝাড়লো।

আব্হা গলায় জিজ্ঞেস করলো : তুমি তো খাও না। খাবে একটা ?

হেসে মাথা নাড়লো নীলু : না।

: বালক—

নীলু এবার রমলাদির চোখে স্থির চোখ রাখলো।

: একটু এদিকে শোনো, রমলাদি ?

একগাল ধোঁয়া ছেড়ে রমলাদি জিজ্ঞেস করলো : প্রাইভেট ?

রমলাদি ও নীলু একটু আড়ালে সরে গেল।

: সেদিন তোমার সাথে আমাব দেখা হয়েছে, তুমি শবরীকে বলে দিয়েছো ?

রমলাদির ছুই ভুঁকর মাঝখানে ছটো দাগ স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

: কে বললো ? তুমি বলে ফেলেছো নাকি ?

নীলুর মুখখানা ভারী হয়ে এলো।

: না। তুমি বলোনি তো ?

: পাগল হয়েছো ? ওসব কথা কি স্পর্শে পারি ?

: তবে শবরী জানলো কি করে ?

: শবরী জেনে কেলেছে ?

: তাহলে তুমিই বলেছো।

: অসম্ভব ! আমি কখন বললাম ?

রমলাদি আর কিছু না বলে হাতের সিগারেটটা টান মেয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর মুখখানা রহস্যময় করে সুবিনয়বাবুর কাছে ফিরে গেল।

কিছুক্ষণ আগে থেকে নীলু সুবিনয়বাবুর মসৃণতাকে সন্দেহে করতে শুরু করেছে। কেন রমলাদি সুবিনয়বাবুর সঙ্গে সিগারেট খায় ? কেন সে একটু আগে দুজনের কাউকেও খুঁজে পায়নি ?

নীলু গঙ্গার ধারের সেই দেবী প্রতিমার সঙ্গে আজকের রমলাদিকে কিছুতেই মেলাতে পারছে না। তাকে রমলাদি আজ যতই বালক বলুক, সে আজ আর বালক নেই। আজকের একদিনের অভিজ্ঞতায় সে প্রায় যৌবন ছাড়িয়ে এসেছে।

আজ তার মনেব ভেতর একটা ওলোট-পালোট কাণ্ড ঘটে গেছে। তবু রমলাদি তাকে কেমন একটা নেশার মতো টানে। কেন যে টানে, সে বুঝে উঠতে পারে না।

সে রমলাদির পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

সুবিনয়বাবু বলেন : যদি যেতেই হয়, রাত বারোটোর আগে তো তোমরা বেরোতেই পারছে না।

নতুন করে আর একটা সিগারেট ধরালেন সুবিনয়বাবু। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন : সকাল থেকেই অবস্থাটা থম্‌থমে ছিল। বোঝা যাচ্ছিল, কিছু একটা হবে। সঙ্গে হয়েছে কি হয়নি, অমনি আরম্ভ হয়ে গেল।

একটু থেমে বললেন : এসব আমাদের একেবারে গা-সহা হয়ে গেছে। সেদিন কলেজ স্ট্রিটের ডাবপট্টিতে ডাব খাচ্ছিলেন এক ভদ্রলোক। এমন সময় বোমাবাজি আরম্ভ হয়ে গেল। সবাই এদিকে-ওদিকে প্রাণের ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে। ভদ্রলোক কিন্তু নির্বিকারভাবে উর্ধ্বমুখে ডাব খেয়ে চলেছেন। 'বোম

পড়ছে', 'বোম পড়ছে'—চারিদিকে চাঁচামেচি, হৈ-হুল্লোড়। ছড়মুড় করে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কে শোনে কার কথা? ভদ্রলোক ডাবেব বাকিটুকু জল গলা দিয়ে নামিয়ে দিয়ে ডাবগুলোকে জিঞ্জেরস কবলেন—কি হয়েছে? তোমরা 'এত চাঁচাচ্ছে কেন? দেখছো না ডাব খাচ্ছি?'

বমলাদি হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল সে। নীলুও না হেসে পাবেনি। ভদ্রলোক কিন্তু নির্বিকার।

হাসি থামলে বমলাদি জিঞ্জেরস কবলো : শববী এখন কেমন আছে? বাড়ি যেতে পাবে তো? কী বিপদেই আজ ফেলেছিল সে! তুমি ওব কাছে যাও, আমি আসছি।

শববী শাড়িটা ঠিক কবে পবে নিচ্ছিল। নীলুকে দেখে বললো : বমলাদিকে জিঞ্জেরস কবলে? কি বললো?

: আসছে ও। তুমি ওকে জিঞ্জেরস কবো।

আয়নার দিকে তাকিয়ে ছিল শববী। আয়নার দিকে তাকিয়েই সে কথাগুলো বললো।

এখন নীলুব বাড়িব কথা মনে পড়ছে। মা হয়তো মীনাকে বাব বাব জিঞ্জেরস কবছে : মীনা, নীলু এলো? কোথায় যাচ্ছে কিছু বলে গেছে তোকে? মাব জন্মে নীলুব ভীষণ কষ্ট হয়। সেদিন হবশংকববাবুব কথায় মা জানতে পেবেছে, সে খুব নিচু দবেব চাকবি পেয়েছে। শুধু মা কেন, মীনা, মিলু সবাই জানতে পেবেছে। তন্দ্রাদি আব তাব বোনেবাও জানে, পেবেছে কিনা কে জানে? কিন্তু সেদিন থেকে সে লক্ষ্য কবছে, মাব ভালোবাসা যেন বেড়ে গেছে।

আব যেই জানুক, তাব চাকবিব কোন খবব যেন শববী বা বমলাদি জানতে না পাবে। সে মনে মনে ঠিক কবে নেয়, সে কোনদিন শববী বা বমলাদিকে তাব বাড়িতে নিঙ্গ যাবে না, বা ওদের কাউকেই সে তাব বাড়িব কিংবা অফিসেব ঠিকানা দেবে না।

শবরী এতক্ষণ তাকে আয়নার ভেতর দিয়ে কোনাকুনি
তাকাচ্ছিল! জিজ্ঞেস করলো : কি ভাবছো ?

: কই, কিছু ভাবছি না তো ?

শবরীর চোখে-মুখে একটা চাপা হাসি উপ্চিয়ে পড়ছিল। টুল-
থেকে উঠে এসে নীলুর ছুখানা হাত ধরে বললো : মিথ্যে কথা।
আমি তোমাকে পবীক্ষা করছিলাম, নীলিম।

নীলুর রক্তের মধ্যে সেই পরিচিত অগ্নিকাণ্ড। সেই পুবেনা
অশ্বখের গভীর উপসর্গগুলো। সে পুড়ছে, পুড়ছে। এবং জানে,
পুড়তে পুড়তে সে একেবারে নীল হয়ে যাচ্ছে। তার এই গভীর
অশ্বখের কথা কেউ জানবে না। কাউকেই সে বলতে পারবে না।
বোঝাতেও পারবে না। এ অশ্বখ তার একেবাবে নিজস্ব। সে
পুড়বে। পুড়তে পুড়তে সে একদিন একটা পোড়া গাছের মতো
রাস্তার ধারে নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকবে।

নীলু কথা বলার চেষ্টা করলো। কিন্তু কোন শব্দ তার গলা
দিয়ে বেরোলো না। নিষ্পলক হু চোখে সে শবরীর দিকে চেয়ে
রইলো।

: বলো না, কি ভাবছো ?

শবরী নীলুব ভেতরের কথা জানতে চায়। নীলু তাকে কি করে
জানাবে তার গোপন অশ্বখের কথা ? আর সে তাকে তার অশ্বখের
কী-ই বা জানাবে ?

সে শুধু মাথা নাড়ে অর্থহীনভাবে।

: বলবে না তো ?

নীলু হেসে বলে : আমার কোন পরীক্ষাই ভালো হয় না,
জানো শবরী।

জুতোয় ঢেউ তুলে রমলাদি আসছে। ওরা হাত ছেড়ে নিরাপদ
দূরত্বে সরে যায়।

: এখন কেমন আছো, শবরী ? ভালো তো ? মনে হচ্ছে,
বেশ ভালো। গোলমাল থেমেছে। যেতে যদি হয়, এই বেলা

বেরিয়ে পড়তে হবে। সুবিনয়বাবু তাঁর গাড়ি করে আমাদের পৌঁছে দেবেন। কিন্তু তুমি যেতে পারবে তো ?

: পারবো, রমলাদি—

নিচে গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। পুরনো মডেলের অস্টিন। সুবিনয়বাবু ড্রাইভারের পাশে বসে সিগারেট খাচ্ছিলেন। পেছনের সিটে ওরা তিনজনে বসলো। অঙ্ককার রাস্তাব ভেতব দিয়ে গাড়ি ছুটে চললো। প্রথমে শবরীকে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি নিউ আলিপুরের দিকে ছুটলো। খুব চাপা গলায় রমলাদি জিজ্ঞেস করলো : আবার কবে দেখা হচ্ছে ?

নীলু বললো : সামনের শনিবার।

: না। সামনের শনিবার বেরোতে পারবো না। তার পরের শনিবার, কেমন ?

: অচ্ছ

রমলাদি নেমে গেলে সুবিনয়বাবু জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কোথায় নামবে হে ?

: গ্রে স্ট্রীট।



পাঁচ মাথার মোড় দিয়ে হাঁটতে গেলেই নীলুর ক্যাপ্টেন মিস্তিরের কথা মনে পড়ে। সেই কালো চেহারার মানুষটি। গায়ে খদ্দেরের পাঞ্জাবি, গলায় পাট-করা খদ্দেরের চাদর। কথা বলতে ভালোবাসেন। বোধ হয় একটু বেশিই কথা বলেন। দিল্লীর লালকেল্লার ভেতরে দেওয়ান-ই-আমের সামনে বসে তিনি যা বলেছিলেন, যদি সব সত্যি হয়, তবে বিচিত্র জীবন ভঙ্গলোকের। বারাসতের রোগা চেহারার গেছো ছেলেটা একদিন কলকাতার চায়ের দোকানের 'বয়'গিরি থেকে কি করে ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের পাইলট হলো এবং কি করে ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের পাইলট থেকে আই. এন. এ.-র পাইলট হলো—এ সব নীলুর স্বপ্নেরও অগম্য। কিন্তু যখন তিনি লালকেল্লার গেটের ওপরের গম্বুজের দিকে চেয়ে বলছিলেন : এই লালকেল্লা আমরা জয় করতে চেয়েছিলুম, কিন্তু পারিনি। তখন তাঁর গলাটা, খুব বেশি আবেগের জগ্নেই সম্ভবত, একটু কেঁপে গিয়েছিল।

পাঁচ মাথার মোড় দিয়ে হাঁটতে গেলেই নীলুর কানে ক্যাপ্টেন মিস্তিরের কথাগুলো বাজতে থাকে। আজীবন ব্যাচেলার। এবং ডেয়ারিং। সেইজগ্নে ডেয়ারিং ছেলেমেয়েদের তিনি খুব পছন্দ করেন। স্কুটার থেকে নামবার সময় যাতে ওদের টাকা-পয়সার অভাব না হয়, তাই তিনি নীলুর হাতে একশো টাকার একখানা নোট গুঁজে দিয়ে গেছেন। পরের দিন ফেরত দিতে গিয়েও নীলু আর শবরী গুঁর দেখা পায়নি। উনি তখন কলকাতার পথে।

নীলু প্রতি মাসেই ভাবে, পরের মাসে সে গুঁর ধর্মতলা স্ট্রীটের অফিসে গিয়ে টাকাটা ফেরত দিয়ে আসবে। তা আর হয়ে ওঠে

না। প্রাতঃ মাসেই খরচ থাকে এবং মাইনের টাকা হাতে আসতে না আসতেই খরচ হয়ে যায়।

পাঁচ মাথার মোড়ে গেলেই নীলুর গুঁর কথা মনে পড়ে।

নেতাজী নাকি গুঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন : হ্যাঁ কালিপদ, তুমিই পারবে।

এসব কথা শুনলে কার না হাসি পায় ? হাসি পায়, কিন্তু বিশ্বাস না করেও পারা যায় না।

সে স্থির করলো, সামনের মাসেই সে ক্যাপ্টেন মিস্তিরের অফিসে যাবে। শবরী যেতে চেয়েছে, কবরী, রমলাদি আর চয়নকাকুও যাবেন বলেছেন। না। সে কাউকেই নিয়ে যাবে না। সে একাই যাবে। সে দেখবে, সে জানবে, ক্যাপ্টেন মিস্তির কে এবং কি। যদি উনি মিথ্যেবাদীই হন, তবে তা নীলু ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ যেন না জানতে পারে।

: মা, সামনের মাসে একশো টাকা আমার বিশেষ দরকার। দেবে মা, একশোটা টাকা।

মা অবাক হয়ে নীলুর মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

: কেন রে, তোর আবার হঠাৎ টাকা কি হবে ?

কিছুদিন হলো, মা নীলুর চালচলনে কিছু অস্থির রকম লক্ষ্য করছে। নীলু কোনদিন রাত করে বাড়ি ফিরতো না। ইদানীং তার বাড়ি ফিরতে প্রায়ই রাত হয়ে যায়। এগুলো মা লক্ষ্য করেছে, কিন্তু কিছু বলেনি। আজ নীলু হঠাৎ একশো টাকা চেয়ে বসায় মা একটু চমকে গেল। নীলু কি তবে খারাপ হয়ে যাচ্ছে ? কোন খারাপ নেশা ?

: সামনের মাসে মিলু স্কলারশিপের টাকা পাবে, তুমিও পেন্সনের টাকা পাবে। আমি আমার মাইনের টাকা থেকে একশো টাকা নিয়ে বাকিটা তোমাকে দিয়ে দেবো।

মা হাসলো। বললো : কেন রে ? কি হবে ?

: পরে বলবো।

মা খুব খুশি হলো না। হয়তো ভাবলো, কতই বা তুই মাইনে পাস্! দেখতেই তো পাচ্ছিষ্ সংসারের কী হাল। তা থেকে একশোটি টাকা নিয়ে নিলে কতই বা আর থাকে!

মা যা-ই ভাবুক, নীলুকে সামনের মাসের মাইনে থেকে একশো টাকা নিতেই হবে।

নীলু চলে যাচ্ছিল। মা হাতের জামার বোতামের ঘর সেলাই করতে করতে বললো : মীনাটা কবে থেকে ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌ করছে, একটা অননপুরো কিনে দেবার জ্ঞে। সবার তো যা হোক কিছু হচ্ছে। ওর কথাটাও একটু ভাবিস্ তোরা। হাতে তুলে যেটুকু দিচ্ছি, তাই খাচ্ছে। যা পাচ্ছে, তাই পরছে। মেয়েটার কোন বায়নাই নেই। আজ তোর বাবা থাকলে—

মা চোখ মুছলো।

ঠিক এই সময়ে নীলু মাব সামনে দাঁড়াতে পারে না। এই সময়টাকে তার ভীষণ ভয়। বাবাব কথা মনে পড়লে সে একেবারে শিশুর মতো অসহায় হয়ে যায়। কি কববে ভেবে পায় না। আসলে কিছুই সে করতে পারে না। খালি খালি বুকব নিচে মোচড় খেতে থাকে। আর তার ভীষণ কান্না পায়।

চোখের পাতায় নুন জমতে থাকে নীলুব। সে ছড়মুড় কবে বেরিয়ে যায়। রাস্তায় গিয়ে মনে পড়ে, মাকে বলে আসতেও আজ সে ভুলে গেছে।

সেদিন অফিস থেকে ফিরে নীলু দরজায় কড়া নাড়লে মীনা এসে দরজা খুলে দিল। আনন্দে চোখ-মুখ তার উপ্‌চিয়ে পড়ছিল।

: দাদা, আজ বেড়িয়াব অফিস থেকে চিঠি এসেছে।

নীলু প্রথমে বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি।

: সত্যি ?

মীনার সম্পর্কে এইটেই ছিল নীলুর উচ্চাশা। শুধু তার নয়, তার বাবাবও ছিল সাধ—মীনা রেডিয়োতে গান গাইবে। তার গান জগৎসুদ্ধ লোক সবাই শুনবে। হয়তো বাবার সেই সাধ

সফল হবে—মীনা রেডিয়োতে গান গাইবে। জগৎসুদ্ধ সবাই শুনবে, কিন্তু যে লোকটি শুনলে সব চেয়ে বেশি খুশি হতো, সেই লোকটিই শুধু শুনবে না। নীলুর চোখের কোণে মুন জমে।

নীলু এসেছে শুনে মা-ও ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

: মা, মীনা রেডিয়োর চিঠি পেয়েছে!

মা হাসতে হাসতে বললো: সেই ছুপুর থেকে ও হানটান করছে তুই কখন আসবি। তোকে বলবে।

মার চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

নীলু বললো: কই, দেখি! চিঠিটা আগে নিয়ে আসবি তো!

মীনা দৌড়ে গেল চিঠিটা আনতে।

মা চোখ মুছে বললো: কী খানন্দ যে হয়েছে ওর! তখন থেকে বোধহয় বিশবাব ও চিঠিটা উন্টপায়ে পড়েছে। তোর আসতে দেরি হচ্ছে দেখে বলছিল, দাদার আসতে আজ এত দেরি হচ্ছে কেন বলো তো, মা?

মা হাসতে থাকে।

ঘরের ভেতর থেকে মীনা চৌচিয়ে জিজ্ঞাস করে: চিঠিটা কোথায় রাখলে, মা? খুঁজে পাচ্ছি না যে—

মা বললো: তুই-ই তো পড়ছিলি চিঠিটা!

: বারে! তুমি দেখছিলে না?

: আমি তো তোকে দিয়ে দিনুম যে রে!

নীলু মাব সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকলো।

মা বাবার ছবির নিচে চিঠিটা রেখে ভুলে গিয়েছিল। মীনা সেটা আবিষ্কার করে এনে নীলুর হাতে দিল।

নীলু চিঠিটা পড়ে বললো: তাহলে কবে 'অডেশান'?

: পরশু, না দাদা?

: হ্যাঁ, পরশুই তো! বেশ সাহস করে গাইবি। দেখবি, ঠিক উত্তরে গেছিস্।

: কি জানি, কেমন হবে! ভীষণ ভয় করেছে আমার—

নীলু তাকে সাহস দিয়ে বলে : ভয় কি ? ব্যোমকেশ নিশ্চয়ই
সাথে যাবে । আর—

নীলু এবার মাকে ডাকলো ।

: মা, শুধু ব্যোমকেশের সাথে মীনা যাবে ? না মা, ওটা
ভালো দেখায় না । মিলুকে বলো, মিলু যেন সঙ্গে যায় ।

মিলুর ওপর মার আজকাল খুব আস্থা নেই । অথচ তাকে
কিছু বলতেও সে পারে না । নীলু জানে, মিলু ভাইবোনদের
মধ্যে ছোট বলে তার প্রতি মার একটু স্নেহের পক্ষপাতিত্ব বেশি ।

মা বলে : মিলু কি যাবে ?

: কেন যাবে না ? আমি ওকে আজ রাত্তিরেই বলে রাখবো ।

সেদিন নীলু মীনার ‘অডেশানের’ চিঠির কথা বন্ধুদের কাছে বললো ।
মীনা প্রোগ্রাম পেলে ওদের চা এবং একটা করে কাট্লেট খাওয়াবার
জন্তে প্রতিশ্রুতিও দিয়ে এলো । অগাধ দিনের তুলনায় সেদিন
সে একটু সকাল-সকালই ফিরলো ।

ব্যোমকেশ এসেছিল । মীনাকে গান শিখিয়ে চলে গেছে । নীলু
জিজ্ঞেস করলো : ব্যোমকেশকে চিঠিখানা দেখিয়েছিস্ ? কি বললো
দেখে ?

: খুব খুশি হয়েছে ।

: সঙ্গে যাবে বলেছে তো ?

মীনা চোখ নামালো । বললো : বলেছে তো যাবে ।

নীলু চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলো : মিলুকে বলেছিস্ ? কি
বললো মিলু ? সঙ্গে যাবে তো ?

ইশারায় মীনা বললো যে, সে চিঠি দেখেছে । কিন্তু কিছু
বলেনি ।

ছোটবেলা থেকেই মিলু একটু অন্তরকম । সবার চেয়ে ছোট
বলে বাবা-মা একটু বেশি আদর দিয়ে কলেছে । পড়াশোনার

সে চিরকালই ভালো। কিন্তু বাড়ির প্রতি তার টান খুব একটা চোখে পড়েনি। বাবা মারা যাবার পর সে আরো কেমন যেন হয়ে গেছে। এ সংসারের সঙ্গে তার যোগসূত্রটাও বড়ো ক্ষীণ হয়ে এসেছে। কলেজে ছেলেরা তার মাথা কাটালো। কেন কাটালো, তা আজো নীলু জানতে পারেনি। মা, মীনা, সে কত জিজ্ঞেস করেছে। সে তার কোনও উত্তর দেয়নি। ঐ ঘটনার পর থেকে সে বাড়ির কারো সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলে না। এমন-কি মার সঙ্গেও না।

নীলু মীনাকে বললো : মাকে খাবার দিতে বল।

ঘরে গিয়ে বললো : মিলু, খাবি চল -

মিলু মোটা একখানা বই খুলে বসে ছিল। বললো : একটু পরে খাবো—

নীলু দ্বিধা ধবলো : আবার একটু পরে কেন? চল, একসঙ্গে বসে খাই।

খুব নিরাসক্তভাবে বইখানা বন্ধ করে মিলু উঠে এলো।

খেতে বসে নীলু হাসতে হাসতে বললো : মীনার 'অডেশানে'র চিঠি এসেছে। দেখেছিস্ মিলু?

ঘাড় কাত করে মিলু জানালো যে, সে দেখেছে।

মীনা দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নীলু বলে : তুইও বসে যা না আমাদের সাথে।

: আমি পরে মার সাথে খাবো।

মীনা রোজ মার সাথে খায়। আজ নীলুর মনের ভেতর একটা পাগলা বাতাস ছটোপুটি খাচ্ছে। মীনাই আজ দরজা খুলে সেই পাগলা বাতাসটাকে তার মনের ভেতর পথ করে দিয়েছে। তার বাবা যা চেয়েছিল, মীনা তা হতে চলেছে। আজ সে তাই মীনাকে সাথে নিয়ে বসে খাবে।

: না মা, মীনা আজ আমাদের সাথে বসে খাবে। তুমি ওর খাবার দিয়ে দাও।

মা মীনার খাবার দিয়ে দিল। মীনা বহুদিন বাদে ওদের সাথে খেতে বসলো।

নীলু রুটি চিবোতে চিবোতে বলে : মীনা যদি একবার প্রোগ্রাম পেয়ে যায়, তবে আর ভাবনা থাকবে না, মা। ও তখন প্রায়ই প্রোগ্রাম পেতে থাকবে।

নীলু আড়চোখে মিলুর দিকে একবার তাকিয়ে নেয়। তারপর বলে : তখন আমরা যে সে লোক নই। বেতার-শিল্পী মীনাঙ্কী বানার্জীর ভাই। আমাদের খাতিরই হবে আলাদা।

মা, মীনা হাসলো নীলুর কথা শুনে। নীলু মিলুর দিকে তাকালো। মিলুও হাসছে।

নীলু মীনাকে জিজ্ঞেস করে : পরশুদিন কখন রে তোর 'অডেশান' ?

: দশটায়।

মিলুকে নীলু জিজ্ঞেস করলো : পরশুদিন দশটায় তোব একবার সময় হবে রে মিলু ?

মিলু মুখ নীচু করে খাচ্ছিল। সে আব মুখ তুললো না।

: কেন ?

: একবার মীনার সঙ্গে রেডিয়ো-অফিসে গেলে ভালো হয়।

মিলু মুখ তুললো : দিদির সঙ্গে ব্যোমকেশদা যাবে না ?

: হ্যাঁ, ব্যোমকেশ যাবে।

: তবে আর দরকার কি ?

নীলু এবার গলা নামিয়ে বললো : দরকার আছে। সে তুই বুঝবি না।

ঘরের মধ্যে কারো মুখে কোন কথা নেই। নীলু বললো : ব্যোমকেশ হাজার হোক, পর। একজন ঘরের মানুষের সঙ্গে যাওয়া উচিত। তাছাড়া ও রেডিয়ো-অফিসে প্রথম যাচ্ছে। বাড়ির কেউ গেলে ওর একটু সাহস বাড়বে।

মিলুর এসব কথা শুনে ভালো লাগছিল না। সে এ

প্রসঙ্গের এখানেই ছেদ টানবার জন্তে বলে : ছেড়ে দে, ব্যোমকেশ গেলেই হবে ।

মিলুর এইকথা নীলুর ভালো লাগলো না । কথাটা সে যেভাবে বললো, তাতে নীলুর মুখে আর হাসির লেশ রইলো না ।

: লোকে বলবে, ওদের বাড়ির মেয়োঁ; তার গানের মাস্টারের সঙ্গে গিয়ে রেডিয়োতে গান গেয়ে এলো । শুনতে ভালো লাগবে কথাটা ?

: যা যা, ওসব বুর্জোয়া ধাঁচের কথা এখন চলে না ।

মিলু চোখ-মুখ বিকৃত করে কথাগুলো বললো । নীলু কয়েক সেকেণ্ড কোন কথা খুঁজে পেল না । তার মুখখানা ভারী, ধমধম করছে ।

সেদিনের মিলু, যাকে সে ঘোড়া হয়ে নিজের পিঠে নিয়ে খেলা কনোচ্ছ. যার একটু শরীর খারাপ হলে সে কি করবে ভেবে পেতো না, সেই মিলুর মুখে সে আজ কী শুনছে ?

: হোক ওসব বুর্জোয়া ধাঁচের কথা । তবু তুই যাবি ।

নীলু এমনভাবে কথাটা বললো, ঘরমুদ্রু শব্দই চমকে উঠলো ।

মীনা আর চুপ করে থাকতে পারলো না । বললো : দাদা, চুপ কর । কাউকেই আমার সাথে যেতে হবে না । আমি একাই যেতে পারবো ।

মীনার কথার শেষাংশ নীলুর কানে বড় করুণ লোকলো । সে বললো : কেন যাবে না ও ? বাড়ির জন্তে ও এইটুকু করতে পারবে না ?

মা নীলুকে থামাবার জন্তে বললো : ওর ওদিন কলেজ আছে । না যেতে চায় তো না যাক্ গে—

নীলু খাওয়ান মন দিল । ভীষণ বিস্মী লাগছে তাব । ওর জন্তে ওষুধের দোকানে যে ধার হয়েছিল, এই সেদিন প্রথম মাসের মাইনের টাকায় সে শোধ করে এসেছে । তারপরের মাসের মাইনে থেকে তার জামা-প্যান্ট কিনে দিয়েছে । নিজের জন্তে এখনো

কিছু করে উঠতে পারেনি। সবই সংসারের পেছনে ঢালছে সে। আজ মিলু তার একটা কথা রাখতে পারলো না! মীনা কি শুধু তার একারই বোন? মিলুর কেউ নয়? জুর্নাম হলে তার একার নামেই হবে, না ওর নামেও হবে?

সব চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। মিলু হঠাৎ কি ভেবে বলে বসলো : ক্লাশ কামাই করে আমি ওর বডিগার্ড হয়ে যেতে পারবো না।

এবার নীলুর মাথার ভেতরটা টনটন করে উঠলো : ভদ্রলোকের মতো কথা বলতে শেখ্ মিলু—

: বারে, আমি অভদ্রলোকের মতো কীই-বা বললুম?

: কি বলেছিস্, আমার আড়ালে মাকে জিজ্ঞাস করিস্।

মিলু এতক্ষণে হাসলো। হাসতে হাসতে বললো : তুই আজ ভীষণ বাজে বকছিস্, দাদা।

রাগে নীলুর গলা বুজে আসছিল। সে মিলুর এ কথায় কোন জবাবই দিল না।

মিলু নিজের মনে হাসছিল। বললো : ক্লাশ কামাই করে আমি যাবো—

নীলু এবার জিজ্ঞাস করলো : মাথা ফাটিয়ে একমাস বাড়িতে শুয়েছিলি। ক্লাশ কামাই হয়নি?

: দ্যাখ্ দাদা, এ তোর পাস কোর্সের বি. এ. পড়া নয়।— ডাক্তারির ক্লাশ। এর একটা ক্লাশের গুরুত্ব কত, সে তুই বুঝবি না।

মা ধমক দেয় : চুপ কর্, মিলু। বেশি বেশি কথা—

নীলু হাসলো। সে খুব রেগে গেলে তার এ বকম হাসি পায়। বললো : তবু তো পাস করেছি, তুই পাস করে এসব কথা বলতে আসিস্—

: পাস তো করেছিস্ টায়েটুয়ে। তার আবার এত কথা!

নীলু মীনার মুখে দিকে তাকালো। মীনা নীলুব মুখের দিকে তাকালো। এত কথা বলতে গিয়ে নীলুর পাভের রুটিগুলো পড়ে আছে। সে এবার খাওয়ার মন দিল।

মিলু ভাবলো, দাদা চূপ করে গিয়ে তাকে বেশ জ্বল করলো-
তো! সে দাদাকে খোঁচা দিল, কিন্তু কোন ফল হলো না।—
এ অসহ! সে গলা নামিয়ে বললো : কেন, তুই যা না?

নীলু বললো : অফিসটা না থাকলে ঠিক যেতুম। বলতে
হতো না।

: কি আবার অফিস! করিস্ তো একটা বেয়ারার চাকরি—

নীলু চিৎকার করে উঠলো : কি বললি তুই? বেয়ারার
চাকরি?

মিলু খুব নিচু গলায় জিজ্ঞাস করলো : তবে তুই किसের চাকরি
করিস্? কোনো অফিসার?

হাতের রুটি পাতে নামিয়ে বেখে দিল নীলু। আজ বড়
সাংঘাতিক জায়গায় মিলু ঘা দিয়ে ফেলেছে। নীলুর বুকের
ভেতরটা ফেটে যাচ্ছিল ভয়ানকভাবে। একটা প্রচণ্ড রকমের
ভূমিকম্পে তাব সমস্ত অস্তিত্বটা আজ হঠাৎ টলে গেছে। চোখ-
মুখ দিয়ে রক্ত ছলকে পড়তে চাইছে যেন। দম বন্ধ হয়ে আসছে
তার। অতিকষ্টে সে একটা ঢোক গিললো : মা—

জোর করে সে একটা শ্বাস টানলো।

: মা, মীনা, তোমরা সবাই আছো। এতদিন বলিনি।
আজ তোমাদের বলছি। আমি খুব ভালো কাজ দিই না।
আমি করি একটা সামান্য বেয়ারার কাজ। এ কাজ আমি নিতে
চাইনি। তবু নিয়েছি।

গলাটা বন্ধ হয়ে আসছিল তার। একটা ঢোক গিলে সে
গলাটাকে পরিষ্কার করে নিতে চাইলো। তারপর চিৎকার করে
উঠলো : কিন্তু কেন নিয়েছি? তোমাদের মুখের দিকে চেয়ে আমাকে
এই নিচু কাজ নিতে হয়েছে। তোমাদের মুখে একখানা করে
শুকনো রুটি জোটাবার জন্যে আমাকে এই নিচু কাজ নিতে
হয়েছে। শোন মিলু, আমি বেয়ারার কাজ করি। যে রুটিগুলো
তুই চিবোচ্ছিলিস্ তা এই বেয়ারাব মাইনের পয়সায়ই তৈরি—

নীলু আর কিছু না বলে উঠে মুখ ধুয়ে ঘরে গিয়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লো ।

ঠিক এই কারণেই নীলু এতদিন মাকে কিছু বলতে পারেনি । মা অশ্রুর বাড়ির জামা সেলাই করে পয়সা নেয়, নীলুর কোনকালেই তা মনঃপূত হয়নি । সে ভেবেছিল, একদিন মাকে সে বারণ করবে । কিন্তু ওপরের হরশংকরবাবু যেদিন গলা চড়িয়ে তার চাকরির কথা জানিয়ে গেছে, সেদিন থেকে মাকে বারণ করার মুখ তার বন্ধ হয়ে গেছে । মাকে সে কোনদিনই বারণ করতে পারবে না ।

আজ অনেকদিন পরে অন্ধকারে চোখ বুজে তার বাবার মুখ মনে পড়লো । এই সাত-আট বছর আগেও সে বাবার গলায় হাত দিয়ে ঘুমিয়েছে । আর আজ সেই নীলু বড়ো কষ্টে পড়ে করছে কিনা একটা বেয়ারার চাকরি । আর চারদিক থেকে তাকে সবাই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারছে ।

এ আমায় তুমি কোথায় ফেলে গেলে, বাবা ?

চোখের কোণদুটো ভীষণ জ্বালা করছিল তার । গলায় ঢোক গিলতেও তার কষ্ট হচ্ছিল । এবার বুঝি দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে সে ।

এর পরের দৃশ্যটা একটু অস্বাভাবিক ।

ঘবে হঠাৎ আলো জ্বলে উঠলো । একটু আগে খাবার ঘরের দরজা বন্ধ হবার শব্দ পেয়েছিল সে । সেখান থেকে মা আর মীনার গলা অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল । কখন দরজা খোলা হয়েছে, সে জানতে পারেনি ।

আলো জ্বালতেই সে চোখ খুললো । মা আর মীনা । ওদের সামনে মিলু । মিলু তার পায়ের ওপর প্রায় উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললো : আমি পরশুদিন দিদির সঙ্গে রেডিয়ার অফিসে যাবো, দাদা । তোকে যা বলেছি সব ফিরিয়ে নিচ্ছি । আমাকে তুই মাপ কর ।

এই দৃশ্যের জগ্নে নীলু প্রস্তুত ছিল না ।

সে বুক হাল্কা করে একটা জোরে নিশ্বাস ছাড়লো।

: যে আঘাত আজ তুই আমাকে দিয়েছিস্, মিলু, ভুলতে সময় লাগবে।

: আমি বুঝতে পারিনি, দাদা। তুই আমাকে ক্ষমা কর—

: ঠিক আছে। যা—

: না। তুই খাবি চল্—

: আজ আব খেতে পাববো না, মিলু। তুই যা—

: তুই না খেলে মা-ও আজ রাত্তিরে কিছু খাবে না।

নীলু মার মুখের দিকে তাকালো। মার চোখে জল। নীলুকে খেতে যেতে হলো।

ব্যাপারট' এখানেই চুকে গিয়েছিল। কিন্তু বাড়িতে একটা চাপা অস্বস্তি সবসময়ই ছিল। নীলু পরের দিন অভ্যেসমতো অফিসে গেল। কিন্তু তাব পরের দিন ছুটি নিল। ন'টা'ব সময় মীনাকে নিয়ে বেড়িয়ে'ব অফিসে রওনা হনো। সঙ্গে ব্যোমকেশও গেল। মিলু বলছিল সঙ্গে যাবে। নীলু তাকে বললো : আমরাতো যাচ্ছি। তুই আব মিছিমিছি ক্লাশ কামাই করবি কেন ?

সমস্ত কিছুই এমন শীতলভাবে ঘটছিল যে, মনে হচ্ছিল এই মানুষগুলি ঠিক যেন মানুষ নয়—ঠিক যেন কাগজের তৈরি, উচ্চতা আছে, চওড়াও আছে কিছুটা, কিন্তু গভীরতা নেই।

মীনার 'অডেশান' হয়ে গেল। প্রোগ্রাম কবে দেয়, কে জানে ! এখন শুধু পিণ্ডনের পথ চেয়ে বসে থাকো। দেবদূতের মতো সে শাকাশ-লোকের খবর নিয়ে আসবে। এখন শুধু তারই প্রতীক্ষা।

ক'দিন বাদেই নীলুর মাইনে হয়ে গেল। নীলু ক'দিন আগে থেকেই ক্যাপ্টেন মিস্তিরের দেওয়া কার্ডটা পকেটে নিয়ে ঘুরছিল। সেদিন মাইনের টাকাগুলো সাবধানে পকেটে পুরে নিয়ে ছুটির পর বেরিয়ে পড়লো।

সামান্য মাইনে থেকে একশোটি টাকা দিয়ে দিলে কীই-বা তার হাতে থাকবে! তাতে মার কষ্ট হবে খুব। কিন্তু এই টাকার জন্মে সে পাঁচমাথার মোড় দিয়ে হাঁটতে পারে না। সেদিন রেডিয়ো-অফিসে যাবার সময় রাজভবনের দক্ষিণপাশে নেতাজীর মূর্তি দেখে শাবার নতুন করে টাকার কথা তার মনে পড়েছিল। এই টাকার জন্মেই সে ক্যাপ্টেন মিত্তিরের সঙ্গে একবার দেখা করতেও যেতে পারেনি। ভদ্রতার খাতিরেও তার একবার যাওয়া উচিত ছিল। শুধু এই টাকার জন্মেই যাওয়া হয়ে উঠেছে না। এখন শবরীর কথা মনে পড়েছে। ক্যাপ্টেন মিত্তিরের অফিসে যাবার সময় শবরী তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছিল। কবরী, রমলাদি, শবরীর চয়নকাকুও যেতে চেয়েছিলেন। নীলুর মনে হয়েছিল, ওঁরা সবাই ব্যাপারটাকে খুব হালকা করে ভেবেছেন। নীলু কিন্তু তা ভাবেনি।

নীলু ভেবেছিল, যদি ক্যাপ্টেন মিত্তিরের সমস্ত কথাই মিথ্যে হয়, তবে তা যেন আব কেউ জানতে না পারে। সে আর ওকথা পৃথিবীর কাউকে বলবে না। সে ভেবেছিল, হয়তো ক্যাপ্টেন মিত্তির কালিঝুলিমাথা প্যাণ্ট আর গেঞ্জি পাবে হাতুড়ি পিটিয়ে বয়লারের কোন অংশ সারাচ্ছেন। ওকে দেখে লজ্জা পাবেন। কিংবা লজ্জা না পেয়ে হাসতে হাসতে তাকে নিয়ে একটা তেল-কালিমাথা টিনের চেয়ারে বসাবেন। পকেটের রুমাল দিয়ে চেয়ারটা পবিত্র করে গিয়ে ওটায় আরো বেশি তেল-কালি মাখিয়ে দেবেন। বলবেন: একা এলে ব্রাদার? সিস্টারটি কই?

একটা লোক তার পিঠে খোঁচা দিয়ে বললো: দাদা, এটা লেডিজ্ সিট। ছেড়ে দিন—

নীলু চমকে গিয়ে সিট ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। বাসের জানলা দিয়ে ঝঁকি মেবে বাসটা কতদূর এসেছে, দেখবার চেষ্টা করলো। কিছুই দেখা গেল না। নীলু হঠাৎ কি ভেবে চেষ্টা করলো নামবার, নামতে নামতে বাসটা অনেকদূর চলে এসেছিল। নেমে পকেটের কার্ডটা বের করে নম্বরটা একবার দেখলো। সামনের একটা

দোকানের সাইনবোর্ডের সঙ্গে নম্বরটা মেলানো। না, ঠিকই নেমেছে।
সে। সামনে আর একটু হাঁটতে হবে।

ছোট্ট একটা দরজার মাথায় ছোট্ট একটি সাইনবোর্ড। ক্যাপ্টেন
মিস্ত্রির কোম্পানির নাম লেখা তাতে। নীলু খুব হতাশ হয়ে গেল।
তবু সাহস করে ভেতরের দিকে এগোলো। সামনে সরু একটা
সিঁড়ি। ওপরে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল। নীলু দাঁড়িয়ে রইলো
নীচে। কারণ, সিঁড়িটা এত সরু যে, কেউ নামলে আর ওঠা যায় না।
একটি যুবক শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে দৃশ্যমান হলো।

: কি খুঁজছেন ?

: এটাই কি ক্যাপ্টেন মিস্ত্রির অফিস ?

: আশুন—

যুবকটির পেছন পেছন নীলু ওপরে উঠে গেল। এবার নীলুর
অবাক হওয়ায় পাল্লা। সাজানো গোছানো ঝকঝকে একটি অফিস।
খুব বড়ো নয়। চেয়ার-টেবিল দেখে মনে হয়, আট-দশ জন এখানে
কাজ করে। এখন ছুটি হয়ে গেছে। তাই ফাঁকা। প্লাইউড
দিয়ে দেয়াল মোড়া। ঝকঝকে পাখা। দেওয়ালের গায়ে গোটা-কয়
স্ট্রীলের আলমারি।

একপাশে বিরাট একখানা টেবিলের ওপর অনেকগুলো ফাইল
এবং দুটি টেলিফোন রাখা আছে। ওখানে বসে আছেন এক
মাঝবয়সী ভদ্রলোক। কৌকড়ানো মাথার চুল। জুলপির, গাগুলিও
ধারাবাহিক। গৌফদাড়ি কামানো। ওঁর পেছনে শুকনো মালা
জড়ানো নেতাজীর পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি।

নীলু সঙ্গের যুবকটিকে বললো : এটা দেখছি অফিস !
ওয়ার্কশপটা কোথায় ?

যুবকটি চটপট উত্তর দিল : ওটা একটু ভেতরের দিকে। আপনার
যা কিছু কথাবার্তা এখানে বললেই হবে।

নীলু কার্ডটা বের করে ওঁর হাতে দিল।

যুবকটি ডাকলো : আশুন—

কার্ডটা হাতে করে সে চেয়ারে-বসা ভদ্রলোকটির কাছে নীলুকে নিয়ে গেল। ভদ্রলোক কি একটা কাইল নিয়ে দেখছিলেন মন দিয়ে। নীলুকে দেখেননি এতক্ষণ। কার্ডটা হাতে নিয়ে নীলুর দিকে তাকালেন খুব অনায়াস ভঙ্গিতে।

: কবে থেকে ডিজ্‌অর্ডার হয়েছে ?

বাংলা উচ্চারণেই নীলু বুঝলো, ভদ্রলোক অবাঙালী। নীলু বললো : না, মানে আমি বয়লারের জগ্গে আসিনি।

: তবে ?

: ক্যাপ্টেন মিস্ত্রিকে আমি খুঁজছি—

: তিনি তো আর এ ফার্মে নেই।

: নেই ?

: ফর অ্যাবাইট টু ম্যান্থ্‌স্‌। দো মাহিনা হলো উনি ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

নীলু পরিস্থিতি বুঝে খুব বিনীতভাবে জিজ্ঞেস কবলো : কোথায় গেছেন, আপনার জানা আছে ?

: স্থির, বলতে পারলাম না আপনাকে।

নীলু ওঠাব চেষ্টা কবছিল। ভদ্রলোক জিজ্ঞেস কবলেন : ব্যাপারটা কি, জানতে পারি না কি ?

: না, মানে, উনি আমাকে আসতে বলেছিলেন।

ভদ্রলোক হা হা করে তেঁসে উঠলেন।

: ও রকম অনেককে উনি আসতে বলেন। মাথাব গোলমাল—

নীলু আর বেশি শুনতে চাইলো না। বললো : আচ্ছা আসি !
নমস্কার—

নীলু সিঁড়ি বেয়ে নেমে কিছুক্ষণের মধ্যেই বাস্তায় এসে পড়লো। কার্ডটা আনতে সে ভোলেনি। পকেটে কার্ডটা নিয়ে বাস-স্টপেজেন্স দিকে পা বাড়ালো।

: শুভ্বন—

নীলু পেছন ফিরে দেখলো, সেই যুবকটি।

: আপনি ক্যাপ্টেন মিস্তিরকে খুঁজছেন, আগে বলেননি কেন ?

নীলু মনে মনে একটু আশাবিহীন হলো। যুবকটি বললো : আমি ভাবলুম, আপনি হয়তো বা অফিসের কাজে এসেছেন।

নীলু সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলো : ক্যাপ্টেন মিস্তির কোথায়, আপনি জানেন ?

: তাহলে শুনুন—

ক্যাপ্টেন মিস্তিরই ছিলেন এই ফার্মের আসল মালিক। তারপর এই পাঞ্জাবি ভদ্রলোক ওঁর সঙ্গে এসে জোটেন। ক্যাপ্টেন মিস্তির প্রায়ই বাইরে বাইরে ঘোরেন। এই ভদ্রলোক এখানে সব দেখাশোনা করতেন। ক্যাপ্টেন মিস্তির এঁকে খুব বিশ্বাস করতেন। সেই সুযোগে ভদ্রলোক সব গিলে বসেছেন। মাঝে একবার ক্যাপ্টেন মিস্তির সন্মোচন হয়ে গিয়েছিলেন। উনি একটু অশুভ টাইপের মানুষ কিনা। অফিসে এলে সারাক্ষণ হৈ-হৈ করবেন। ওয়ার্কারদের খাওয়াবেন, টাকা-পয়সা দিয়ে বলবেন, যাও, খেয়ে এসো। কারো মেয়ের বিয়ে কিংবা ছেলের অসুখ—ক্যাপ্টেন মিস্তির একবার শুনেই হলো। তবে হ্যাঁ, লোকটা কাজ জানতেন।

: তারপর ?

: তারপর—হ্যাঁ, সেই যে সন্মোচন হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ কদিন ফিরে এলেন। তখনও তিনি জানতেন না, তিনি পথে বসেছেন। জানলেন মাস দুই আগে। টাকার ব্যাপারে ভীষণ তর্কাতর্কি সেদিন চলছিল, আমরা যে-যার বাড়ি চলে গেলাম। কি হলো জানি না, পরের দিন থেকে ক্যাপ্টেন মিস্তিরকে আর আমরা দেখিনি। কি জানি, আবার সন্মোচন হয়ে চলে গেছেন কিনা—

নীলু অবাক হয়ে যুবকটির মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

: আচ্ছা, ওঁর বাড়ির ঠিকানাটা বলতে পারেন আপনি ?

যুবকটি হাসলো। বললো : বাড়ি কোথায় ? বাড়ি-ঘর সবই তো ছিল ওঁর এখানেই—

নীলু যুবকটির সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে থাকে। বেতে বেতে জিজ্ঞেস করে : আচ্ছা, আপনাদের কাছে উনি কখনো গল্প করতেন না ?

: গল্প ?

যুবকটি আবার হাসলো : উনি আবার গল্প করতেন না ? সাংঘাতিক সব গল্প বলতেন। সব ওঁর জীবনের গল্প, নেতাজীর গল্প—আরো কত কি।

: সব সত্যি ?

নীলু জিজ্ঞেস করে। যুবকটি বলে : সত্যি কিনা, কি করে জ্ঞানবো, বলুন ?

: আপনারা সব বিশ্বাস করতেন ?

: হ্যাঁ। বিশ্বাসও করতাম, আবার অবিশ্বাসও করতাম। তবে কি জানেন, সবাই কিন্তু ওঁকে ভালোবাসতো। খুব স্পষ্টবাদী লোক ছিলেন। আর দিলটা ছিল বড়ো ভালো।

কখন সূর্য ডুবে গিয়েছিল। কলকাতার আকাশে অস্বচ্ছ অন্ধকার জন্মছিল। নীলু বাড়ি ফিরে মার হাতে পুরো মাসের মাইনেটাই তুলে দিতে মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো : তুই যে বলছিলি, তোব একশো টাকা দরকার ? নিবি না ?

নীলু ক্লান্তভাবে বললো : না মা, আর আমার দরকার নেই।

মা কিছু বুঝতে না পেরে ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো।

ঘরটাতে আবার মাকড়সার ঝুল জমছে। কোণগুলোকে একটু বেশি অন্ধকার মনে হয়। বালুকের গায়ে এত অন্ধকার ভালো লাগে না। নীলুর দিকের দেয়ালে একটা ছবি আছে। এক বছরের নীলুকে কোলে নিয়ে তার বাবা ছবিটা তুলেছিল। কালি-ঝুলিতে ছবিটাকে একেবারেই বোঝা যায় না। অশুদিকের দেয়ালে কোন ছবি নেই। কিন্তু মাকড়সার ঝুলে একটা ছবি ফুটে উঠেছে। নীলুর মনে হয়, একটা উলঙ্গ মেয়েকে অনেকগুলো লোক টানতে টানতে কোথায় নিয়ে চলেছে। সেই ছবির ভেতর নীলু কখনোও তন্দ্রাদিকে দেখতে পায়, কখনো শবরীকে, কখনো রমলাদিকে। কিন্তু আশ্চর্য, লোকগুলোর কারো মাথা নেই। ওপরের দিকটায় মাকড়সারা জাল বোনেনি বলেই ছবিটা এমন অসম্পূর্ণ ঠেকে। নীলু রোজ ভাবে, আজ হয়তো ওপরের দিকে মাকড়সারা জাল দেবে। কাল সে লোকগুলোকে চিনতে পারবে। কিন্তু লোকগুলোর পা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়, মাথা গজায় না।

হাতের ওপর মাথা রেখে নীলু বিছানার ওপর সটান শুয়ে থাকে।

সেদিন সন্ধ্যয় তাদের বাড়ির সামনে একটা ট্যাঙ্ক এসে দাঁড়ালো। সে এখনো পর্যন্ত রমলাদি বা শবরীকে তার ঠিকানা দেয়নি, অফিসের ঠিকানাও না। এই বাড়ির বাসিন্দাদের থেকে সে ওদের ছুঁজনকে পৃথক রাখতে চায়।

তাহলে আজ সন্ধ্যয় কে এলো ?

কান পেতে শুয়ে রইলো সে। কারো পায়ের শব্দ এদিকে এলো না।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। মিলু এখনো ফরেনি। মীনা গান গাইছে। মার সেলাই কল অন্ধকাব ফুঁড়ে ফুঁড়ে সেলাই করে চলেছে।

এক সময় একজোড়া হিল-দেওয়া জুতোর শব্দ তার ঘরের দরজায় এসে থামলো।

: নীলু, আজ চললুম, ভাই।

নীলু উঠে বসলো।

: চললে তন্দ্রাদি? যাও—

যাও বললেও তন্দ্রাদি চলে যায় না। দরজার ফ্রেমে একটা পরিচিত ছবির মতো সে দাঁড়িয়ে থাকে। তার চোখে-মুখে অনেকগুলো কথা উঁকি মারছিল। নীলু জানে, তন্দ্রাদি এরপর তাকে কি বলবে। না, তন্দ্রাদি আর কোনদিন তাকে তার ব্রেসিয়ারের হুক পরিয়ে দিতে বলবে না।

তন্দ্রাদির হিল-তোলা জুতোর শব্দ হয়তো মা-ও পেয়েছিল। মা বেরিয়ে আসে, জানতে পেরে মীনাও বেরিয়ে আসে।

: চললুম কাকিমা। এবার সম্বলপুরে চলে যাচ্ছি। কবে ফিরবো, কিছু ঠিক নেই।

তন্দ্রাদি মার পায়ের ধুলো নিলো। মা-ও তাকে সুখী হবার আশীর্বাদ করলো। নীলু জানে না, তন্দ্রাদি কোনদিন সুখী হবে কিনা। কিন্তু জানে, নীলু নিজে কোনদিন সুখী হবে না। কারণ তার কিশোর বয়সে যে নীল অসুখ তন্দ্রাদি তার বৃকের মাঝখানে রেখে দিয়েছে, তা তাকে কোনদিনই সুখী হতে দেবে না।

তন্দ্রাদিকে তার এখন কেমন যেন ভীষণ স্বার্থপর মনে হয়। সে আজ সুখের সন্ধানে সুদূর সম্বলপুরে চলে যাচ্ছে। আর সে তার জালানো সেই নীলশিখাটাকে বৃকে নিয়ে আমরণ এই অন্ধকার ঘরের একরাশ মাকড়সার বুলের মধ্যে জ্বলতে জ্বলতে নীল হতে থাকে।

গলিতে তন্দ্রাদির বাবা, মা আর বোনেরা বোধহয় ভিড় করেছিল।, নীলু বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনলো, তাদের কলরবের মাঝখানে ট্যান্ডিটা স্টার্ট নিয়ে একটা ছর্বোধ্য শব্দ করতে করতে তাদের গলির মোড় পেরিয়ে গেল।

শনিবার এলেই নীলুর আজকাল ভীষণ ক্লান্তি লাগে। সেই একই-
 ্রাবে পরিষ্কার জামাজুতো পরতে হয় তাকে। সেজগ্গে অফিসে
 তাকে একই সন্নেহ এবং নানা অবাস্তিত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে
 হয়। ওসব তার একদম ভালো লাগে না আজকাল। তারপর
 রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে সেই মেট্রো সিনেমার একপাশে দাঁড়ানো।
 সেই ক্লান্তিকর প্রতীক্ষা। রমলাদি কখন আসবে, তাকে নিয়ে
 যাবে কোন সিনেমায় কিংবা কোন রেস্টোরাঁয় কিংবা যাত্নঘরে
 কিংবা ভিস্টোরিয়ায়। রমলাদির ঘড়ি এবং হার ছিনতাই হবার
 পর ওরা আর গন্ধার ধারে যায় না। মাঝে মাঝে রমলাদি
 তাকে সুবিনয়বাবুর চেম্বারে জোর করে টেনে নিয়ে যায়। নীলুর
 ওখানে যেতে ভালো লাগে না। নীলুকে পাশে বসিয়ে ওখানে
 রমলাদি সুবিনয়বাবুর সঙ্গে সিগারেট খায়। এসব ভীষণ বিশ্রী
 লাগে তার।

অফিসেব রমেনবাবু কেন যেন নীলুকে ছচক্ষে দেখতে পারে
 না। শনিবার হলেই লোকটা ইচ্ছে করে তার সঙ্গে খারাপ
 ব্যবহার করবে কিংবা বিনা কারণে হুঁএকটা বাজে মন্তব্য করবে।
 যাতে বেরোতে দেরি হয়, সেজগ্গে ছুটো বেজে গেলেও তাকে
 কাজের ফরমাস করবে। মাঝে মাঝে লোকটার ওপব তার
 এমন রাগ হয় যে, হাতের কাছে কিছু পেলে ঙ্গে হয়ে। ছুঁড়ে
 মারবে।

আজও ছুটোর পর সে তাকে সাহেবের কাছে ইচ্ছে করেই
 পাঠালো এক গাদা ফাইলে সই করিয়ে আনবার জগ্গে।
 রমেনবাবু খুব ধূর্ত লোক। সে ভালোভাবেই জানে, সাহেব ফাইল-
 গুলো না পড়ে সই করবে না। নীলু ঘড়ি দেখছিল, ফাইলগুলোয়
 সই করতে সাহেবের প্রায় চল্লিশ মিনিট সময় লাগলো।
 রমেনবাবু লোকটা এইভাবে এক টিলে ঠিনটে পাখি মারলো।

নীলুকে আটকালো, সাহেবও আটকিয়ে গেল। সেই সঙ্গে লোকটা সাহেবকেও বুঝিয়ে দিল, কোম্পানির কাজে তার প্রেম কত গভীর! জগতে এক ধরনের লোক আছে যারা পরের ক্ষতি করে কিংবা তাকে অযথা খোঁচা দিয়ে এক রকমের বিসৃদ্ধ আনন্দ পায় রমেনবাবু তাদেরই একজন। একেবারে পাজির পা-চাটা!

মেট্রো সিনেমার সামনে পৌছোতে নীলুর আজ দেরি হয়ে গেল। রমলাদি দাঁড়িয়েছিল রোদ মুখে নিয়ে। লাল রঙের বাটিক প্রিন্টের শাড়ি পরেছে আজ রমলাদি। তার সঙ্গে মিল করে ব্লাউজ। তার শ্যাম্পু-করা চুলে অবেলার রোদ পড়েছে বেশ গাঢ় হয়ে, রোদ পড়েছে তার ভরা বয়সের পুরুষ্ট ছুখানা গালে। স্বাভাবিক কারণেই রমলাদিকে আজ ঠিক দেবী-মূর্তির মতো মনে হচ্ছে না তার। ঠোটে পুরু প্রস্টের লিপস্টিকে এবং চোখের কাজলে রমলাদিকে তার একটু অগ্ররকম মনে হচ্ছে আজ। তার ওপর ঘামে ভিজে সমস্ত মুখখানা তার বড় বিস্মীরকম জব্জব্ব করছে।

রাস্তার লোকগুলো রমলাদির দিকে কিরে তাকাতে তাকাতে বাচ্ছে। নীলুর কেমন যেন আজ কিছুই ভালো লাগছে না।

সে রমলাদির ওপর তার দীর্ঘ ছায়া ফেলে দাঁড়ালো।

: আজ এত দেরি করলে যে ?

রমলাদি রুমাল দিয়ে তার ঘামে ভেসে-যাওয়া মুখ মুছলো।

: কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছো তুমি ?

: প্রায় দুটো থেকে। ভেবেছিলুম, তোমাকে নিয়ে আজ একটা সিনেমা দেখবো—

: অকসেসে ভীষণ কাজের চাপ বেড়েছে।

দুজনে হাঁটতে লাগলো ভিড় কাটিয়ে। নীলুর ছায়া সারাক্ষণ রমলাদিকে ঘিরে ছিল। কারো মুখে কথা ছিল না। নীলু অনেক চেষ্টা করলো কথা বলার। কিন্তু মনের ভেতর সে আজ কোন কথাই খুঁজে পাচ্ছে না।

হঠাৎ রমলাদি হাসলো।

: কই, কিছু জিজ্ঞেস করলে না তো আজ আমি এত সেজেছি কেন ?

তার চোখে রোদ পড়ছিল। কোণাকুণি তাকালো সে।

: হ্যাঁ, তাই তো। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, রমলাদি।

নীলু হাসলো।

: তুমি আজকাল কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে, নীলিম—

নীলু চোখ তুলে রমলাদির দিকে সরাসরি তাকালো।

: কেমন বলো তো ?

: কি জানি, কেমন যেন—

: তাই নাকি ?

নীলু একটু চেপ্টাকৃতভাবে হাসলো। আবার কয়েক মিনিটের নীরবতা। নীলু একটা বড়ো করে শ্বাস নিল। বললো : সত্যি রমলাদি, ঠিকই বলেছো। আমি দিন দিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছি। অথচ কেন যে এমন হয়ে যাচ্ছি, ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু—যাক, বলো রমলাদি, তুমি আজ এত সেজেছো কেন ?

রমলাদি চুপ।

: কি হলো রমলাদি, বলো—

ঠোঁট ফুলিয়ে রাগ দেখালো রমলাদি।

: তুমি আজও আমাকে নাম ধরে ডাকতে পারলে না? রমলাদি, রমলাদি, রমলাদি! আমি কি শুধু রমলা হতে পারি না ?

নীলু এবার না হেসে পারলো না।

: তুমি যদি খুশি হও, আমি তোমাকে রমলা বলেই ডাকতে পারি। রমলা, শুধু রমলা। নাও, বলো—

এখন রমলাদির চোখে রোদ পড়ছে না। সে পূর্ণ চোখে নীলুর মুখের দিকে তাকালো : আজ আমার জন্মদিন—

: আগে বলবে তো। দোকানদার সব ছাড়িয়ে এলুম, আর এখন উনি বলছেন, আজ আমার জন্মদিন !

রমলা নীলুর কথা শুনে শরীর কাঁকিয়ে হাসতে থাকে।

চৌরঙ্গীর এদিকটা একটু কাঁকা। স্টপেজ কম থাকায় ট্রাম এবং বাসগুলো খুব টানা বেরিয়ে যায়। লোকের ভিড় তাই অনেকটা কম। বেড়াবার এবং স্বস্তিতে ছটো কথা বলার এ হচ্ছে খুব পছন্দসই জায়গা। রমলা কাঁধের কাপড় সোজানুজি সরিয়ে দিয়ে নীলুর হাত ধরে বললো : বলো না, আমার জন্মদিনে আজ তুমি আমাকে কি দেবে? বলো—

নীলুর বুকের ভেতর নীল শিখাটার দাপাদাপি শুরু হয়ে গেছে। তার পাঁজরগুলো এবার বুঝি ধসে ধসে পড়বে। খুব বেশি সময় লাগবে না আর। গলাটা তার অকারণে জড়িয়ে আসছিল। সে একটা ঢোক গিলে বললো : তাই তো, কি দিই বলো তো তোমাকে?

ঠিক তখনই নীলুর মনে পড়েছিল, ঘরে তার ভীষণ অভাব এবং অফুরন্ত মাকড়সার ঝুল। মা পাড়ার লোকেদের বাড়ির জামা-ব্লাউজ সেলাই করে পয়সা আনে। মীনার কপালে আজও একটা তানপুরো জুটলো না। সে একটা সওদাগরি অফিসের এল. এস. স্টাফ। তার ছোটভাই মিলু খেতে বসে তাই নিয়ে তাকে অপমান করে।

রমলা বলে : ওপারে চलो, নীলিম—অনেক গাছ রয়েছে ছায়ায় ছায়ায় হাঁটা যাবে বেশ।

: চলো—

রাস্তা পেরোতে গিয়ে দেখা হয়ে গেল হরশংকরবাবুর সঙ্গে। নীলুর মুখটা হঠাৎ শুকিয়ে যায়। সে তাড়াতাড়ি রমলার হাতটা ছেড়ে দিয়ে সরে আসে। এখানেও হরশংকরবাবু? লোকটা কি গোয়েন্দা পুলিশ নাকি? যেখানেই সে যাচ্ছে, লোকটা ঠিক সেখানে এসে হাজির! উক্—

নীলু চোখ সরিয়ে নিয়ে না দেখার ভান করে চলে যাচ্ছিল। হরশংকরবাবু নীলুকে এবং রমলাকে দেখতে দেখতে স্থির হয়ে

দাঁড়িয়ে গেলেন। নীলু তাঁর দিকে আর একবারও না তাকিয়ে রমলাকে লক্ষ্য করে জোরে জোরে বলতে লাগলো : আপনি যে শার্ভিস্টার কথা বললেন, তার মাইনে কতো ? আটশো ? না ; হাজার যদি দেয়, তাহলে ভেবে দেখতে পারি।

রমলা কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলে : তুমি কি বকছো পাগলের মতো ? আমি—

হরশংকরবাবু ছুঁপা এগিয়ে এলেন ভুরু বাঁকিয়ে।

: নীলু নাকি ?

নীলু তাঁর কথা না শোনার ভান করে রমলাকে বললো : ইফ্ দে পে মি ওয়ান থাউজ্যান্ড, আই ক্যান থিংক টু জয়েন্, আদারওয়াইজ্—

: ও নীলু—

নীলু এবান হরশংকরবাবুর দিকে তাকালো। এমনভাবে তাকালো, যেন, তাকে সে এইমাত্র দেখলো।

: জ্যাঠামশাই যে ! কি ব্যাপার ? আপনি এখানে ?

হরশংকরবাবু নীলুর কথাগুলো শুনে একটু দমে গিয়েছিলেন। তবু রমলার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে নীলুর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন : ঠিক চিনতে পেরেছি। এ রকম চেহারা নীলুর না হলে কার হবে ?

নীলুর চঠাৎ মনে পড়ে গেল, আজ শনিবার। বেসকোর্সের দিন। সে হরশংকরবাবুকে জিজ্ঞেস করে বসে : আপনি এখন মাঠ থেকে বুঝি ?

হরশংকরবাবু ধরা পড়ে গিয়েছেন। তিনি হাসতে হাসতে বলেন : না হে না, একটু এইদিকে, মানে—

: মানে ঘোড়দৌড়ের মাঠে। এতে লজ্জার কি আছে ? আমাদের বড়ো সাহেবও তো প্রতি শনিবারে—

: যান নাকি ? তবে আজ আমি কিন্তু জিতেছি ! দাখো, কথাটা কিন্তু তোমার জেঠিমাকে—

: পাগল হয়েছেন ? আচ্ছা, আপনি আশুন। একটা জরুরী

বিক্রমের টক হচ্ছে আমাদের। ইক্রেস ম্যান্ডাম, ইক্ দে পে মি ওয়ান
খাউজ্যাও পার মান্ধ—

হরশংকরবাবু তখনও ঠার দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞেস করলেন : বাড়ি,
যাবে না, নীলু ?

রমলা হঠাৎ বলে বসলো : তুমি কি বলছে যা তা, আমি—

নীলু ডান হাত তুলে হরশংকরবাবুকে বললো : ও. কে.
জ্যাঠামশাই—

তারপর রমলার দিকে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলতে লাগলো :
দেম আই ক্যান থিংক্, আই মিন্, থিংক্ ওভার—ওভার —

নীলু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো, হরশংকরবাবু এদিক-ওদিক ভালো
করে দেখে নিয়ে রাস্তা পেবিয় চলে গেলেন, তখন সে একটা দম
ছেড়ে বললো : ওভার—

রমলা কিছু বুঝতে না পেবে বললো : কি ওভার ?

: ডেঞ্জার !

: অ্যা ?

রমলা ভালো কবে নীলুর মুখের দিকে তাকালো। তাবপব
রাস্তার ওপারে হরশংকরবাবুকে চলে যেতে দেখে জিজ্ঞেস কবলো :
লোকটা তোমাব কেউ হয় বুঝি ?

: কেউ না। পাড়ার লোক। ভেরি ডেঞ্জাবাস্ ! ওকে ঠকাবাব
জন্তে আমি ওসব বলছিলুম। তুমি একটু বুঝবে তো ! তা নয়.
তুমি আমাকে একেবারে ঝুলিয়ে দিচ্ছিলে আব কি !

এবার রমলা তার সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে হেসে উঠলো : সত্যি,
আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি।

: চমৎকার অভিনয় করিনি ? তুমি পারলে না তাই, নইলে—

: সত্যি, আমি বুঝতে পারিনি—

মন্বদানের শেষে রোড রোডের ওপাশে সূর্য ডুবলো। ঝাঁকড়া

গাছগুলোর নিচে ছায়া গাঢ়তর হচ্ছে। ডানদিকে ঘাসের ওপর দিয়ে
ছ'একখানা এসপ্লানেডগামী ট্রাম মাঝে-মাঝে প্রচণ্ড উৎসাহে
ছুটে যাচ্ছে।

রমলা আবার নীলুর হাত ধরলো।

: বলো না নীলিম, আমার জন্মদিনে আজ তুমি আমায়
কি দেবে ?

: তাই তো, কি দিই বলো তো তোমাকে ?

তার আবার মার কথা, মীনার কথা, মিলুর কথা মনে পড়লো।
কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে তারা। বাবা মারা যাবার পর ওদের
সংসারটা তার কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না। একদিক সামলে উঠতে না
উঠতেই আরেকটা দিক ভেঙে পড়ছে। এসব কথা সে কোনদিন
রমলা বা শবরী—কাউকেই বলতে পারবে না।

হঠাৎ তার শবরীর কথা মনে পড়লো।

সেদিনেব ঘটনার পর শবরীর সঙ্গে তার বার-দুই দেখা হয়েছে।
শেষ যেদিন দেখা হয়েছিল, সেদিন নিজের থেকেই বলেছিল : আজ
হাতে অনেকখানি সময় আছে, চলো না, কোথাও বসে একটু
গল্প করি !

নীলু বলেছিল : চলো কোন রেস্তোরাঁয়—

: না, চলো একটা সিনেমা দেখি।

শেষে ওরা একটা সিনেমা হলে ঢুকে ছবি দেখার নাম করে
ছ' ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা শুধু নিজেদের দেখছিল।

রমলা নীলুর হাতে চাপ দিয়ে জিজ্ঞেস করে : বলো না, কি
দেবে আমাকে ?

নীলু বললো : আজ শবরী সঙ্গে থাকলে বেশ হতো, তাই না ?

রমলা নীলুর হাত ছেড়ে দিল। ছায়া আবো গাঢ় হচ্ছে।

নীলু জিজ্ঞেস করে : কি হলো ?

: তোমার শবরীর কথা ভাবা শেষ হোক, তারপর—

নীলু হাসলো। রমলার হাতটা জোর করে হাতের মুঠোয় নিল।

: তুমি কুৰুতে পারলে না; আমি বলছিলুম, আজ তোমার
জন্মদিনে শবরী থাকলে সবাই মিলে আনন্দ করা যেতো—

নীলুৰ কথা শুনে রমলা খুব খুশি হয়েছে মনে হলো না। বমলা
কিছু সময় তার নিজের মধ্যে তলিয়ে গেল। কি ভেবে হঠাৎ সে
জিজ্ঞেস করে বললো: সেদিনের পর শবরীৰ সঙ্গে তোমাব আৰ
দেখা হয়নি ?

কি বলবে, নীলুকে একটু ভাবতে হলো। কাৰণ, শবরী তাকে
তাব সঙ্গে দেখা হওয়াৰ কথা বমলাকে বলতে বাৰণ কৰে দিয়েছে।
নীলু বললো: না।

বমলা নীলুৰ মুখেৰ দিকে তাকালো।

: তুমি মিথ্যাবাদী।

: বিশ্বাস কৰো—

বমলা এবাব হেসে ফেললো। বললো: কাল আমি শবরীৰদেব
বাডি গিয়েছিলুম। শবরী আমাকে সব বলেছে।

: কি বলেছে তোমাকে ?

হাসতে হাসতে বমলা নীলুৰ গায়েৰ ওপৰ এসে পড়ে। বলে:
সব বলেছে। সুবিনয়বাবুৰ চেম্বাৰেৰ কথা, সিনেমাৰ যাওয়াৰ
কথা—সব।

নীলুৰ মনেৰ ভেতৰ অনেক দূৰ পর্যন্ত সমস্ত এক নিমেষে খালি
হয়ে যায়। কোথাও কিছু সে খুঁজে পায় না। শবরী কি সত্যিই
বলেছে ? না কি এসব বমলাৰ নিজের বানানো গল্প ? সে কিছুই
বুঝে উঠতে পারে না। একইভাবে দিল্লীৰ ঘটনা তাকে গোপন
রাখতে বলে শবরী নিজেই আৰাব বমলাৰ কাছে তা কাঁস কৰে
দিয়েছিল। শবরী, তুমি কি আমাকে কাৰো কাছে ঠিক থাকতে
দেবে না ? আমাকে সবার কাছে মিথ্যাবাদী বানিয়ে তুমি কী সুখ
পাও, শবরী ?

রমলা হাসতে থাকে।

: কি হলো ? চুপ কৰে রইলে যে ?

নীলু রমলার মুখের দিকে নির্বোধের মতো চেয়ে রইলো।

কাল ওকে বলতে গিয়েছিলুম, আজ আমার জন্মদিন। আজ সঙ্গে থাকতে ওকে খুব করে বলেছিলুম। ও বললো, আংগেরা থেকেই ওর নাকি আজকের অ্যাপ্রয়েন্টমেন্ট হয়ে আছে।

নীলু জিজ্ঞেস করে : তুমি সত্যি বলছো, শবরী তোমাকে সব বলেছে ?

: বলেছে। কিন্তু তুমি অত 'শেকী' হয়ে যাচ্ছে। কেন ? ওসব এমনি হয়ে থাকে।

: তুমি বুঝতে পারছো না রমলা, আমার মনের ভেতর কি হয়ে যাচ্ছে।

রমলা আর হাসে না। গম্ভীরভাবে বলে : বুঝি, সবই বুঝি। কিন্তু তুমি ওর দিকটা একেবারেই দেখছো না, নীলিম। ও কি করবে ? ওর মন যে এক মুহূর্ত স্থির থাকে না। তুমি ওকে দেখছো এক বছর। আর আমি ওকে দেখছি চার বছর।

নীলু রমলার মুখের দিকে সোজানুজি চেয়ে থাকে।

: আর একটা কথা জেনে রাখো, নীলিম। যা সহজে পাওয়া যায়, সেদিক থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে, যা পাওয়া কঠিন, তাকেই পাওয়ার জন্যে সবাই পাগল হয়ে ছোটে। তুমি ওকে চেনো না। ও অনেক দিন থেকে অন্য একজনকে পাওয়ার জন্যে পাগল।

নীলু বুঝতে পারে, আজকের মতো গরীব সে কোনদিনই ছিল না। গরীব সে ছিল ঠিকই, কিন্তু আজকের মতো সর্বস্বান্ত সে কখনো হয়নি। রমলার কথা শুনে তার একেবারেই ভালো লাগছে না। তবু সে তার যথাসর্বস্ব দিয়ে আরো কিছু শুনে চাইলো, আরো সর্বস্বান্ত হতে চাইলো।

: তোমাকে তাহলে আরো বলি শোনো। সেদিন শবরী মোটেই অসুস্থ হয়নি। সেদিন সে একজনের কাছে ভীষণ কঠোর ব্যবহার পেয়েছিল বলে ওরকম করছিল। সন্দেহ করে ছেলেটা সেদিন ওকে আমার সামনেই যা নয় তা বলে চলে গিয়েছিল।

ময়দানের অন্ধকারের দিকে রমলা তার জ্বাঙ্গু-করা একমাথা চুল উড়িয়ে দিয়ে নীলুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললো : তোমাকে মৃগ্নয়ের কথা কখনোদিন কি বলেছি, নীলিম ?

: কে মৃগ্নয় ?

: ছেলোট মোটেই সুবিধের নয়। শবরীকে তাই নিয়ে অনেক বুঝিয়েছি। ও কিন্তু আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। কাল বললুম এত করে। ওর নাকি আজ মৃগ্নয়ের সঙ্গে অ্যাপারেন্টমেন্ট— আসতে পারবে না। আচ্ছা নীলিম, ও কখনোদিন তোমাকে মৃগ্নয়ের কথা বলেনি ?

খুব স্পষ্টভাবে নীলু বললো : না।

: আমি ওকে কতদিন বলেছি, শবরী, মৃগ্নয়ের কথা নীলিমকে জানিয়ে দাও। নইলে ও তোমার কাছে কত প্রত্যাশা করে আছে। সে ভুমি জানো না। তোমাকে তো জানি ; তোমার মতো ছেলেকে ও যদি ছঃখ দেয়, তা হবে ওর জীবনের সবচেয়ে বড়ো ট্র্যাজিডি।

নীলু রমলার হাতটায় টান দিয়ে বলে : থাক্ ওসব কথা। অল্প কিছু বলো।

রমলা সমস্ত শরীরে তার চাপা হাসি ছড়িয়ে দিল।

: শুনতে ভালো লাগছে না এসব, তাই না ? না লাগবারই কথা। কিন্তু আমার বিশ্রী লাগছে এই জগ্গে যে, কথাটা তোমাকে আমার মুখ থেকে শুনতে হলো।

নীলুর এখন ময়দানের ভেতর দিয়ে হৈ-হৈ করে ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে। এই ঘাস, অন্ধকার, আকাশ—সবকিছু তেড়েফুঁড়ে ছুটে যেতে পারলে বেশ হয়। কি ভেবে সে চারদিকে ভালো করে একবার তাকালো। ধারে-কাছে কাউকে চোখে পড়লো না। সে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। গাছের নিচে জমাট পুরনো অন্ধকারে শুধু সে আর রমলা দাঁড়িয়ে। তাদেরও কেউ দেখছে না। রমলা সুন্দরী, একটু বেশি স্বাস্থ্যবতী। বয়েসে তার চেয়ে—হ্যাঁ, বড়ই। হোক বড়। অন্ধকারে বয়েসের কোন মাইলস্টোন স্পষ্ট থাকে না।

একটা হা-হা বাতাস তার মনের ভেতর দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত প্রচণ্ড আনন্দে সবকিছু ভাঙতে ভাঙতে ছুটে চলে যাচ্ছে। নীলু ঝপ করে রমলার শ্রাম্পু-করা একপিঠ চুল হাতের মুঠোয় চেপে টান দিল।

: উঃ, লাগে—

রমলার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর তার কানে পায়ের তলায় একটা শুকনো পাতার গুঁড়িয়ে যাবার শব্দের মতো মনে হলো।

নীলুর হাতের মুঠো আরো শক্ত হলো। খুব জোরে সে রমলার মুখটাকে তার ঠোঁটের কাছে আনলো। কয়েক মুহূর্ত। তারপরই হাতের মুঠোটাকে দূরে অন্ধকারের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সে নিজের মনে হা-হা করে হেসে উঠলো পাগলের মতো।

নীলু জানে না, রমলাও এইরকম একটা কিছু চাইছিল।

সে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে একটা গাছের চওড়া কাণ্ডের ওপর গা এলিয়ে দিল। সমস্ত শরীরে তার হাসি খেলছিল। ছুচোখ ঘোর হয়ে কালো হয়ে এসেছিল তার। গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে রমলা দেখছিল, এরপর নীলু কী করে, কতদূর যায়!

নীলু একটু হাঁপিয়ে উঠেছিল। তার ভেতরে যেন একসঙ্গে অনেকগুলো বোমা ফেটেছে। তার ধোঁয়ায় এবং ধাক্কায় তার সমস্ত অনুভূতি যেন একেবারে ভেঁতা হয়ে গেছে। সে জোরে জোরে কয়েকটা শ্বাস নিল। তারপর যখন দেখলো, তার পা ছুটো বেশ টলছে, তখন সে মোটা একটা গাছের শেকড় পেয়ে তার ওপর নিশ্চল বসে পড়লো।

ওদের পাশ দিয়ে ভীষণ স্বল্প বেশবাসের একটি যুবতীর হাত ধরে হুজুঁন যুবক অন্ধকার ময়দানের দিকে দ্রুত চলে যায়। ঘাসের ওপর যান্ত্রিক শব্দ বিছিয়ে দিয়ে ছলতে ছলতে সন্দের ট্রাম ভেসে চলে গেল। আবার নির্জন হয়ে যায় জায়গাটা। শুধু কয়েকটা

ঝিঁঝিপোকা গাছের মগডালে চড়ে বিদ্যুটেভাবে পরিজ্বাহি
টাঁচাছিল।

রমলা নীলুর পাশে এসে দাঁড়ালো—একেবারে গা ঘেঁষে।
হাসছিল সে।

: কি হলো? পারলে না তো?

নীলু ঠোঁট চেপে ওর দিকে একবার তাকালো।

এবার রমলা শব্দ করে হেসে উঠলো: আমি ভেবেছিলুম কি,
সত্যি তুমি রেগে গেছ। শবরীর ওপর রাগ করে আমার ওপর শোধ
ভুলছো।

: হুঁ—নীলু একটু রহস্যময় হাসি হাসলো।

রমলা ওর পাশে খুব ঘনিষ্ঠভাবে এসে বসে।

: তুমি আমার ওপর রাগ করোনি তো, নীলিম?

রাগ? নীলু ভাবে, কেন সে রমলার ওপর রাগ করবে? তাকে
শবরীর বিষয় সে সমস্ত বলেছে বলে? কিন্তু কে এই মৃগয়? শবরী
তো তাকে কোনদিন মৃগয়ের কথা বলেনি। অবশ্য, কোথায় যেন সে
এই নামটা শুনেছিল। সে মনে করবার চেষ্টা করে। শবরীর
বাড়িতে কিংবা অল্প কোথাও তার কানে নামটা এসেছিল একবার।
কবরী কিংবা রমলা—কেউ একজন বলেছিল নামটা। নামটা নিয়ে
সে কোনদিন অতঁশত ভাবেনি, ভাববার প্রয়োজনও বোধ করেনি।
আজ তাকে নামটা এবং সেই সঙ্গে তার সাথে শবরীর একটা
সম্পর্কের কথা বলে রমলা কি খুব অস্বস্তায় করেছে? এখন রমলার
অশ্বে দুঃখ হয় তার।

: রমলা—

: কি?

নীলু জোরে একটা শ্বাস নিল।

: আমার কোন ভবিষ্যৎ নেই। এগোবার কোন নিশানাও নেই।
এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আজ কয়েক বছর আমি মার খাচ্ছি।
দেখছি, আমার এক-একটা দিক নোনা লেগে ধসে পড়ছে। আমি

কাউকে বলতে পারছি না, আমার জীবনের ভেতর কী একটা ঘটে
যাচ্ছে। জানো রমলা, এই রকম মার খেতে খেতে আমি একদিন
শেষ হয়ে যাবো।

রমলা নীলুর কাঁধের ওপর দিয়ে তার একটা হাত ছড়িয়ে দেয়।

: আচ্ছা নীলিম, তোমাকে একটা কথা বলবো ?

নীলু খুব শীতলভাবে বললো : বলা—

রমলা হঠাৎ যেন পাথরের মূর্তি হয়ে গেল। তার শরীরের
কোথাও বৃষ্টি প্রাণের সাড়া ছিল না।

: রমলা—

: উ—

: বলবে না তোমার কথা ?

রমলা নীরব।

: শোনো, নীলিম, আমার নামে কিছু ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স আছে।
চলো, আমরা কোথাও চলে যাই।

নীলু তেমনি ঠায় বসে রইলো। মুখ তুলে রমলার দিকে একবার
তাকালোও না। রমলা তার কাঁধের ওপর থেকে হাতটা সরিয়ে
আনে।

: কি ভাবছো, নীলিম ?

নীলু মুখ তুলে তাকায়।

: না রমলা। আমার কোথাও পালালে চলবে না। আমাকে
শেষ পর্যন্ত এখানেই লড়তে হবে।

রমলা রুমাল দিয়ে মুখ মোছে।

: জানো নীলিম, তোমাকে যেদিন প্রথম দেখি, সেদিন থেকেই
আমার কি যে হয়েছে, তোমাকে বোঝাতে পারবো না। দিনের পর
দিন এখানে ছুটে এসেছি—শুধু তোমাকে একটু দেখবো বসে।

জীবনে নীলু এমন কথা কারো কাছে শোনেনি, তবু রমলার কথা
শুনে তার হাসি পেল। সে ধীরে ধীরে বললো : রমলা, তোমার
কথা আমার মনে থাকবে।

ভারপন্ন সে উঠে দাঁড়ালো ।

: শোন রমলা, এবার থেকে আর আমি আসতে পারবো না ।
তুমিও আর এসো না । আমার ভীষণ ক্লান্তি লাগে ।

রমলা মাথা নিচু করে বসে রইলো ।

: ভেবেছিলুম, তুমি আমার দিকটা একটু সহানুভূতি দিয়ে
দেখবে ।

নীলুর মনে হলো, মাটির ভলা থেকে যেন সে রমলার কথাগুলো
শুনলো । সে রমলাকে কিছু বলার জগ্গে মনে মনে প্রস্তুত হলো ।
পাছে তার কথাগুলো অস্পষ্ট শোনায়, সেজগ্গে সে গলাটাকে বেড়ে
পরিকার করে নিল ।

: রমলা, তুমি সত্যি করে বলো তো, সুবিনয়বাবুর সঙ্গে তোমার
কোন রিলেশন নেই ?

রমলা হঠাৎ মুখ তুলে ভাকালো ।

: সুবিনয়বাবু একজন সম্মানিত লোক, তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলার
আগে তোমার একটু চিন্তা করে বলা উচিত ।

এবার নীলু শব্দ করে হেসে উঠলো । সুবিনয়বাবুর সঙ্গে হঠাৎ
রমলার উধাও হয়ে যাওয়া এবং তারপর তাঁর সঙ্গে সিগারেট টানতে
টানতে ফিরে আসা—নীলুর সব মনে পড়লো ।

: তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলে ।

: কি তোমার প্রশ্ন ?' বলো, আমি তার জবাব দিচ্ছি—

দূর থেকে একটা আব্‌ছা আলো রমলার মুখের ওপর পড়েছিল ।
সেই আলোতে রমলার মুখখানা খুব কঠিন মনে হচ্ছিল তার ।
সে বললো : সেদিন সুবিনয়বাবুর চেহারে আমাকে শবরীর কাছে
রেখে তুমি আর সুবিনয়বাবু কোথায় চলে গিয়েছিলে ?

রমলা মুখ নিচু করলো ।

: বলো, কোথাও যাওনি ?

রমলা এবার হেসে উঠলো ।

: শোনো নীলিম—

উঠে ঝাড়ালো সে।

: তোমাকে তাহলে খুলেই বলি। সুবিনয়ের সঙ্গে সামনের সপ্তাহেই আমার একটা সেটল্‌মেন্ট হচ্ছে। কাগজপত্র সব রেডি—

একটু থেমে সে বললো : সুবিনয় তোমার চেয়ে নিঃসন্দেহে বেটার ক্যাণ্ডিডেট!

: নিঃসন্দেহে—

রমলার গলা কাঁপছিল। তার গলার স্বর থেমে থেমে যাচ্ছিল। সে বললো : বিশ্বাস করো, নীলিম, তবু আমি তোমাকে দেখবো বলেই প্রতি শনিবার এখানে ছুটে এসেছি।

কথাগুলো নীলু শুনতে পেয়েছে কিনা বোঝা গেল না। নীলু হেসে বললো : তাহলে আর আমাকে নিয়ে এত গল্প বানালে কেন? যাক, আশা করি তুমি সুখী হবে রমলা।

হঠাৎ রমলা কি ভেবে এগিয়ে এসে নীলুর হাত ধরলো। এখন ছুজনের মুখে গাছের ডালপালার ফাঁক গলে অস্পষ্ট একটা আলো একরাশ পাতার ছায়া ফেলে পরস্পরকে ভীষণ অচেনা করে তুলেছে। রমলা হাসলো। কিন্তু নীলুর চোখে ভীষণ বীভৎস লাগছে তার মুখটা।

: এরপর আর দেখা হচ্ছে না তাহলে—

: না হওয়াই ভালো, রমলা।

: তাহলে নীলিম, তোমাকে আমার একটা কথা রাখতে হবে। আজ আমার জন্মদিন। আর আজ থেকে, তুমি বলছো তোমার সাথে আমার আর দেখা হবে না। আজ তুমি আমাকে এমন কিছু একটা দাও, যাতে আমি তোমাকে চিরদিন মনে করে রাখবো—

নীলু তার মুখের দিকে চেয়ে ছিল। রমলা নীলুর গলায় হাত রেখে তার মুখখানাকে খুব কাছে এগিয়ে ধরলো।

রমলার মুখে অনেকগুলো পাতার ছায়া পড়েছে। সেদিকে চেয়ে নীলুর বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে। ধীরে ধীরে মুখ সরিয়ে আনে সে।

. : জীবনে একজনের কাছে অস্তুত তুমি পবিত্র থাকো রমলা এবং আমাকেও তা থাকতে দাও ।

রমলার হাত শিথিল হয়ে নেমে গেল । গায়ের শাড়িটা ঠিক করে নিতে নিতে সে বলে : কাওয়ার্ড ! অপদার্থ তুমি একটা !

রমলা অঙ্ককার থেকে বেরিয়ে ট্রাম লাইন পার হয়ে আলোতে চলে গেল । একটা ট্যান্ডি চলে যাবার পর আর ওকে দেখা গেল না ।



বাড়িতে পা দিয়েই নীলু মীনাকে জিজ্ঞেস করলো : মীনা, কবে যেন রেডিওতে তোর প্রোগ্রাম ? কাল, না পরশু ?

: পরশু—

: কোথায় শোনা যায় বলতো প্রোগ্রামটা ?

বাড়িতে রেডিয়ো সেট নেই। ছিল,—বিক্রি করে দিতে হয়েছে। মীনা বলে : ওপরে জ্যাঠাবাবুদের রেডিয়োতে শুনলে হবে।

: তুই একটু বলে রাখিস। সময়টাও জানিয়ে দিস। অ্যা ?

সেদিন রাত্রে খুব মেঘ ডেকে বৃষ্টি নামলো। সারারাত টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি হচ্ছিল। সকালেও থামলো না। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে নীলু বাজার সারলো। রোববার। অফিস ছিল না। তাই রক্ষে।

কিন্তু বারোটা বাজতেই সে বেরিয়ে পড়লো। তখনও বৃষ্টি পড়ছে। খুব জোরে নয়, সামান্য ঝিরঝিরে বৃষ্টি। রাস্তায় কাদা, লোক-চলাচল খুব কম। আকাশটাকে খুব ভিজে স্নাতকসতে মনে হচ্ছে। ভাবগতিক দেখে মনে হয়, আরো বৃষ্টি হবে সহজে থামবে না।

বাসে আজ ভিড় নেই। নীলু ওপরে উঠে গিয়ে একপাশে বসলো। শবরীদের বাড়ি সে সেই-যে গিয়েছিল, আর যায়নি। একবার অবিশ্বি সে গিয়েছিল রাস্তিরে, স্মবিনয়বাবুর গাড়িতে করে শবরীকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিতে। আর সে ও পাড়ায় যায়নি। প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার পর আর ও পাড়ায় যেতে তার মন ওঠে না। অবিশ্বি, যাবারও খুব একটা প্রয়োজন হয়নি। কারণ শবরী শাস্তি ঘোষ

স্ট্রীটের মোড়ে তার সাথে দেখা করেছে, অথবা অসুভাবে দেখা হয়ে গেছে ওদের।

বাসটা চৌরঙ্গী হয়ে যখন ছুটছিল, তখন নীলুর কালকের কথা মনে পড়ে যায়। যে গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে কাল সে রমলার সঙ্গে কথা বলছিল, এখন তা বৃষ্টিতে ভিজছে। মেঘলা আকাশ এবং প্যাচপেচে বৃষ্টিতে ময়দানের চরিত্র আজ ভীষণ অস্পষ্ট। রমলার কথা সে আজ একেবারে ভাবতেই চাইছে না। কারণ, রমলার কথা ভাবতে গেলেই অজস্র পাতার ছায়াভরা একটা মুখ মনে পড়ে যায়। সেই মুখের পাশ থেকে ভয়ে এবং ঘৃণায় সে তার মুখখানা খুব সাহস করে সরিয়ে নিয়েছিল। এই রমলাকে প্রথম দিন থেকেই তার দেবী-মূর্তি মনে হয়েছে। কিন্তু সেই মূর্তিকে সুবিনয়বাবুর চেয়ারে সে নষ্ট হয়ে যেতে দেখেছে। আবার কাল সেই নষ্ট দেবী-মূর্তির ভেতর থেকে সে অনেক খড় আর মাটি খুঁজে পেয়েছে। একটা ময়লা পুরনো স্মৃতির মতো সে কালকের সন্ধেটাকে মন থেকে মুছে কেলতে চেষ্টা করে।

কাল থেকে শবরীর কথা তার ভীষণ মনে পড়ছে। তার টানা-টানা চোখ, মসৃণ কপাল, সরু পাতলা ঠোঁট সারাক্ষণ তার মনের ওপর ভাসছে। কাল রমলা শবরী সম্পর্কে তার মনে একটা ধস ধরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সে জানে, শবরীর ওপর তার কেমন যেন একটা অধিকার ঠিকই আছে এবং তা ঠিক থাকবেই। দিল্লীর হোটেলে তারা একই ঘরে পাশাপাশি বিছানায় শুয়েছে। সুবিনয়বাবুর চেয়ারে শবরী তাকে নিবিড়ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তার অধিকার মিথ্যে নয়। রমলা অবিশ্রি যা নয় তা বলে তার মনটাকে ধসিয়ে দিতে চেয়েছে। কিন্তু সে তার কথা বিশ্বাসই করেনি। সে খুব সাবধানে রমলার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছে।

শবরী, আমি শুধু তোমার জন্মেই নষ্ট হয়ে যাইনি, শুধু তোমার জন্মেই আমি আজও পবিত্র রয়েছি।

গড়িয়াহাটের মোড়। এখানে বাসটা ঘুরে যাবে। সে হুড়মুড়

করে নেমে পড়ে। এখনও তেমনি টিপ্‌টিপ্‌ করে বৃষ্টি পড়ছে।
 খামার কোন লক্ষণই নেই। আবার বাসে উঠতে হবে। যত
 শিগ্‌গীর সম্ভব, তাকে শবরীদেব বাড়ি পৌঁছাতে হবে। শবরীর
 কাছে তার মনের বোঝা সমস্ত আজ নামাতে হবে। কিন্তু শবরী
 যদি বাড়ি না থাকে? যদি রমলা জোর করে কোথাও তাকে আজ
 টেনে নিয়ে গিয়ে থাকে?

নীলুর বুকের ভেতরটা টনটন করে ওঠে।

বাস থেকে নামতে নামতে নীলু একটু ভিজ্ঞে গেল। পকেট
 থেকে রুমাল বার করে মাথা মুছলো। এবার ঐ ত্রিকোণ পার্কের
 পাশ দিয়ে তাকে খানিকটা রাস্তা হেঁটে যেতে হবে। গতবারে
 এই রাস্তায় ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে সে মহা ঝামেলায় জড়িয়ে
 পড়েছিল। কি জানি আজও যদি তাকে তেমনি সবাই ঘিরে
 ফেলে? সে কি বলবে? তারা আজ তাকে নিশ্চয়ই চিনতে পেরে
 ছেড়ে দেবে। কিন্তু ততক্ষণে যে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তার
 যে অনেক কথা আছে শবরীর সঙ্গে।

বৃষ্টি এখন বোধ হয় থামবে না। নীলু আর মিছিমিছি
 দাঁড়িয়ে না থেকে বৃষ্টির মধ্যেই রুমাল মাথায় দিয়ে হাঁটতে লাগলো।
 পার্কটাকে বাঁদিকে রেখে সে হাঁটছে। তার মাথা থেকে কৌটার
 কৌটার জল কপাল গড়িয়ে মুখের ওপর দিয়ে ঝরে পড়ছে।

শবরী, তুমি দেখলে না, আজ কিভাবে আমি তোমার কাছে
 যাচ্ছি।

লম্বা লম্বা পা কেলে নীলু হেঁটে চলেছে। সামনে রেইন
 কোট পরে একটি মেয়ে আসছে এদিকে। রেইন কোট পরলে সব
 মেয়েকেই প্রায় একই রকম দেখতে লাগে। শবরীও রেইন কোট
 পরলে তাকে এই রকমেই দেখাতো। নীলু পাশ দিয়ে চলে
 যাচ্ছিল। এমন সময় সে শবরীর গলা স্পষ্ট শুনলো : নীলু—

নীলু ভাবতেই পারেনি, এখানে এমনভাবে শবরীর সঙ্গে
 তার দেখা হয়ে যাবে। তার রাস্তার ওপরেই নাচতে ইচ্ছে করছিল।

ইচ্ছে করছিল ছুটে গিয়ে সে শবরীকে বৃকের ওপর হ'হাত দিয়ে চেপে ধরবে।

: আমাকে দেখতে পাওনি তুমি?!

নীলু হাসলো। রুমালে মুখ মুছে বললো: দেখেছি, কিন্তু চিনতে পারিনি—

: চিনতেই পারলে না?

শবরী মুখ মুছলো।

নীলু বললো: কি জানি, যদি অশু কেউ হয়, তাই মুখের দিকে বেশি তাকাইনি।

শবরী শব্দ করে হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো: কোথায় যাচ্ছিলে পাগলের মতো?

: ঠিক জানি না, কোথায় যাচ্ছিলুম—

শবরী এবার আর হাসলো না। নীলুব মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলো। আবার সেই নীলশিখা! নীলুব বৃকের ভেতর আবার সেই অগ্নিকাণ্ড! গলায় সেই আঠালো বিষ! হাতের তালুতে বৃষ্টির মতো ঘাম! শবরী, আমাকে তুমি বাঁচতে দেবে না?

: নীলিম, তোমার কি কোন অসুখ করেছে?

অসুখ! অসুখ! ভীষণ অসুখ আমার। জানো শবরী, আমি এক গভীর অসুখে ভুগছি। কিন্তু সে অসুখের কথা আমি তোমাকে বলতে পারবো না। পৃথিবীর কাউকে বলতে পারবো না।

শবরী তখনো নীলুর দিকে চেয়ে আছে। চোখে তার সেই নিবিড় প্রশ্ন: নীলিম, তোমার কি কোন অসুখ করেছে?

নীলিম, নীলিম! শবরী, জগতে একমাত্র তোমার কাছেই আমার ঐ নাম। এ নাম শুধু তোমার জন্মেই। তুমি আবাব ডাকো, আবার আমাকে ঐ নামে ডাকো। আমি শুনতে শুনতে যেন এই বৃষ্টির সঙ্গে বৃষ্টি হয়ে যাই।

: তোমার কি কোন অসুখ করেছে?

: কেন বলো তো?

: চেহারাটা কেমন শুকিয়ে গেছে যেন—
: কাল সারারাত ঘুমোতে পারিনি, শবরী।
: কেন, কি হয়েছিল কাল রাতে ?
: তোমার কথা ভীষণ মনে পড়ছিল কাল। কাল রাতে মেঘ
ডাকছিল, শুনেছিলে ?

: হ্যাঁ, ভীষণ ভয় করছিল আমার।
শবরী, বলো—তোমার শুধু ভয়ই করছিল ? আর কিছু হয়নি ?
আমার কথা মনে পড়েনি তোমার ?

: তোমার কথা মনে পড়লো। আমার আর ঘুম এলো না।
শবরী হাসলো : তুমি একটা পাগল।
: হয়তো তাই—
: এভাবে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজবে ? না কি যাবে
কোনদিকে ?

: চলো—
: কোথায় ?
: তুমি যেখানে নিয়ে যাবে।
: ঠিক তো ? চলো তাহলে—
বাসের স্ট্যাণ্ডে পৌঁছে শবরী বললো : অনেকক্ষণ থেকে
বেরোবো ভাবছি। অবিনমামা এসেছে, তাই বেরোতে দেরি হয়ে
গেল।

নীলু কপালের ওপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে শবরীর মুখের
দিকে তাকালো।

: অবিনমামা এসেছেন ? যদি না আসতেন, তাহলে তুমি
আগেই বেরিয়ে যেতে, না ? তাহলে তো তোমার সাথে আমার
দেখাই হতো না।

: তুমি তো আমাকে কোন খবর দিয়ে আসেনি —
মনে মনে নীলু শবরীর অবিনমামাকে স্মরণ করলো। নীলু
শবরীর অবিনমামাকে কখনো দেখেনি। কিন্তু মনে মনে তাঁর

একটা ছবি সে খুব স্পষ্টভাবে এঁকে নিয়েছে। অনেকটা দেবদূতের মতো চেহারা। তাঁর জগ্গেই তো সে হোটেলের শবরীকে চারদিনের জন্তে পেয়েছিল। আজও শবরীকে সে পেয়েছে তাঁর জগ্গেই। সে আলতোভাবে জিজ্ঞেস করে : মামীমাও নিশ্চয়ই এসেছেন ?

শবরীর হুচোখে বাঁকা বিহ্বল খেলে গেল।

: হ্যাঁ। কেন, দেখা করবে নাকি ? খুব সুন্দরী কিন্তু—

শবরী আরো কিছু বলতে চাইছিল। তার আগেই পিচ্ছিল রাস্তায় গজ্‌রাত্তে গজ্‌রাত্তে বাস এসে পড়লো। শবরী আর বেশি কিছু না বলে বাসে উঠে পড়লো।

কয়েকটা মাত্র স্টপেজ। সিট খালি থাকার সঙ্গেও ওরা বসলো না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গড়িয়াহাট। ওরা নেমে রাস্তা ঘুরে আরেকটা বাসে উঠলো।

ভিড় ছিল বেশ। সিট পেতে সময় লাগলো একটু। সিটে বসতে বসতে শবরী জিজ্ঞেস করে : এর মধ্যে রমলাদির সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি ?

: হয়েছিল।

: কিছু বলেনি ?

: কি নিয়ে ?

শবরীর মসৃণ কপালে কতকগুলো রেখা ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল।

: ধরো, তোমার সখ্‌কে—আমার সখ্‌কে—

নীলু কি বলবে ভেবে পেল না। অথচ অনেক কথাই এক সঙ্গে তার মনের ওপর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছিল। সব তাকে আজ শবরীর কাছে খুলে বলতে হবে। কিন্তু কোন্‌খানে শুরু করতে হবে, সে বুকে উঠতে পারছে না।

: সে অনেক কথা। চলো, তোমাকে বলবো।

শবরী নিজের মনে একটু হাসলো। বললো : থাক, বলতে হবে না।

নীলু কেমন যেন চূপসে গেল। সেই কথাগুলো বলবার জন্তেই তো এই ঝড়বৃষ্টি মাথায় নিয়ে সে ছুটে এসেছে। সেই কথাগুলোর জন্তেই তো সে কাল সারারাত ঘুমোতে পারেনি। আজ সকাল থেকে শবরীদের বাড়ি আসবার জন্তে সে যে ছট্‌ফট্‌ করেছে, সে তো শবরীকে সেই কথাগুলো বলবার জন্তেই। আর শবরী এখন এসব শুনতেই চায় না? নীলু শবরীর মুখের দিকে সরাসরি তাকালো।

: কিন্তু তোমাকে ওকথাগুলো যে সব শুনতে হবে, শবরী—

শবরী নীলুর কথায় হয়তো ভেতরে ভেতরে একটু চমকে উঠছিল। বাইরে তার কিছুই বোঝা গেল না। মুখে কিছুই বললো না সে। শুধু আয়ত দুচোখ মেলে সে নীলুর মুখখানা বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো।

: শবরী, আমার অনেক কথা আছে আজ।

: সগে, সব কথা শুনবো। কোথাও বসে—

নীলু বাইরের দিকে চেয়ে রইলো। বৃষ্টি থামবে বলে মনে হচ্ছে। আকাশে মেঘ তেমনি ঢেকে আছে। কিন্তু মৃতের মুখের হাসির মতো একটা আবছা আলো মেঘ চুঁইয়ে ফুটে বেরোচ্ছে। রাস্তার সেই প্যাচপেচে কাদা ধীরে ধীরে শুকিয়ে এখন ঘন হচ্ছে। ফুটপাতে মাহুশের ভিড় বাড়ছে। সব দেখেশুনে মনে হচ্ছে বৃষ্টি বোধ হয় থামবে।

শবরী নীলুকে দেখছিল। মেঘলা আকাশের মিহিন্ আলো তার মুখে পড়েছে। দাড়ি কামায়নি সে আজ। তবু তাকে আজ বেশ লাগছে দেখতে। ছেনে যেমন দেখেছিল, কিংবা দিন্নীতে, প্রায় অনেকটা সেই রকম।

অনেকক্ষণ ধরে সে নীলুকে দেখছিল। যেন সে এই প্রথম নীলুকে দেখছে।

: নীলিম, তুমি বোধ হয় মৃন্ময়কে কখনো দেখোনি, না?

নীলুর বুকের নিচে কেমন ঘেন একটা অঘটন ঘটে গেল। মৃন্ময়? হ্যাঁ, এই নামটাই কাল সে অনেকবার রমলার মুখে

শনেছে। শুনতে তার ভালো লাগেনি। তবু রমলা তাকে জোর করে শুনিয়েছে। সে ঐ নামটা আর শুনতে চায় না। কিন্তু শবরীর মুখ থেকেও তাকে আজ ঐ নামটা শুনতে হলো? সে তার নিজের কান ছটোকে প্রথমে বিশ্বাস করে উঠতে পারে না। নিশ্চয়ই সে ভুল শনেছে!

: উ? কি বললে?

: তুমি মৃগ্ময়কে কখনো দেখেছো?

না, ভুল নয়। মৃগ্ময়! স্পষ্টই সে শনেছে। নীলুর মাথার ভেতর অনেকগুলো ডবল ডেকার যেন এলোমেলো ছুটে যেতে গিয়ে শেষে এক দারুণ সংঘর্ষে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তার মনে হলো, যেন বাসটা ব্রেক-ডাউন হয়ে অনেকক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে স্টপেজ নয়, দাঁড়াবার কথাও নয়।

সে ঘাড় ফিরিয়ে শবরীর দিকে তাকালো। না, সে ঐ নামে কখনো কাউকে দেখেছে বলে তার মনে পড়ছে না।

: কে মৃগ্ময়?

: ভীষণ ভালো ছেলে। চলো, আজ তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো।

নীলু নিজের মনে হেসে উঠলো।

: কাল রমলার মুখে শুনলুম ওর কথা, আজ তোমার মুখে শুনছি। খুব বিখ্যাত লোক নিশ্চয়ই—

শবরী ভেবেছিল, হয়তো নীলু মৃগ্ময়ের নাম শুনে চমকে যাবে। নীলুকে হাসতে দেখে শবরী একটু ঝাপসা হয়ে গেল।

: বিখ্যাত নয় ঠিকই। তবে খুব ভালো ছেলে।

শবরী একটু থামলো। সে আরো ঝাপসা হয়ে গেল। বললো : তোমরা ব্যাটা ছেলেরা ভীষণ হিংস্রটে—

নীলু হাসলো।

: আর তোমরা মেয়েরা স্বর্গীয় দেবী—?

হঠাৎ শবরী বললো : এসো, নেমে পড়ি । স্টপেজ ছাড়িয়ে চলল এসেছি । আবার একটু হাঁটতে হবে ।

বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল । আকাশে একটু একটু রোদও ফুটেছে । হয়তো এরপর মেঘ কেটে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে ।

নীলু জিজ্ঞেস করলো : এটা তো এল্‌গিন রোডের মোড় । এখানে নামলে যে ?

শবরী খুব তাড়াতাড়ি ডান হাতের কব্‌জি ঘুরিয়ে ঘড়িটা দেখে নিল ।

: এখানে একটা কাজ আছে । বলো, ততক্ষণ তোমার কথাটা শুনি ।

একটা "।ড়িবারান্দা" নিচে ছুজনে গিয়ে দাঁড়ালো । ফুটপাথ এখন শুকিয়ে উঠেছে । বাসে বাসেই শবরী গায়ের রেইন কোট খুলে ফেলেছিল । এবার পাট করে ওটা বাঁ হাতে ঝুলিয়ে নিল । শবরীকে এখন সুন্দর লাগছে নীলুর । গোলাপী রঙের শাড়ির সঙ্গে মিল করে সে পরেছে গোলাপী রঙের ব্লাউজ । কপালে গোলাপী রঙের টিপ । ঠোঁটের লিপস্টিক—তাও গোলাপী রঙের । নীলু শবরীকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিল একবার ।

* : শবরী, কাল রমলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার . ঢাখো, এতদিন তাকে জেনেছিলুম রমলাদি বলে । কাল হঠাৎ সে শুধু রমলা হতে চাইলো—

শবরী হাসলো ।

: তারপর ?

: তারপর তার কথাবার্তা থেকে বুঝলুম, সে একটা কিছু সেটল্‌ করে ফেলতে চায় ।

শবরী কিছুক্ষণ নীলুর মুখের দিকে চেয়ে রইলো । তারপর শব্দ করে হেসে উঠলো ।

নীলু হাসতে পারলো না। বললো : ওর যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে।
বোঝাই তো, ওর পক্ষে আর অপেক্ষা করে থাকা সম্ভব নয়।

শবরী গম্ভীর হয়ে গেল।

: বেশ তো, তুমি ওর সঙ্গে—ঐ যে কি বললে—একটা সেটল
করে ফেললেই তো পারে।

নীলু শবরীর চোখের তেতর তাকালো। শবরী কি সত্যি তাই
চায়? কিংবা এটা তার বাইরের কথা কথার কথা একটা? সে কিছুই
বুঝে উঠতে পারে না।

চোখের সামনে দিয়ে অনেক মেয়ে-পুরুষ হেঁটে চলে গেল।
ট্রাম বাস ট্যান্ডি ছুটে চলে যায়। নীলু চেয়ে দেখলো, মেঘ কেটে
যাচ্ছে। একটা হাঁ-করা কাক কি করে বুঝেছে রাত্তার কলে জল
আসার সময় হয়েছে। তাই সে কলের মুখে বসে হাঁ করে অপেক্ষা
করছে, কলে জল আসতে কত দেরি?

শবরী, শুধু তুমিই বুঝলে না, আমি কি ভীষণ ভূষণ নিয়ে
তোমার কাছে ছুটে এসেছি। তুমি বুঝলে না, আমি কেন কাল
রমলাকে কিরিয়ে দিয়েছি।

নীলু কাকটার দিকে চেয়ে নিজের মনে একটু হাসলো।
বললো : দেখো শবরী, কাকটা কি করে বুঝেছে, কলে জল আসার
সময় হয়েছে।

শবরী ঘড়ি দেখলো। বললো : জল আসার সময় কখন হয়ে
গেছে। বলে সে হাসলো।

: আসলে কাকটা জানে না, এ কলে তার জন্তে কোনদিন জল
আসবে না।

জলের কলটা খারাপ হয়ে পড়ে আছে কতকাল। নীলু জানে
না, হয়তো অনেকদিন থেকেই খারাপ হয়ে পড়ে আছে। আরো
হয়তো অনেকদিন এমনি পড়ে থাকবে।

: সত্যি নীলিম, তুমি রমলাদির সঙ্গে একটা সেটল করে
ফেললে পারে।

নীলুর গলাটা একটু অবিশ্বাস্ত রকমের জোর শোনালো : তাহলে
কি তুমি সত্যি খুশি হও ?

: সত্যি ।

নীলু বিশ্বাস করলো না শবরীর 'সত্যি' । অথচ সে অনেক চেষ্টা
করেও শবরীর মুখের দিকে তাকাতে পারলো না । তাহলে
শুবিনয়বাবুর চেহারে শবরীর সমস্ত কিছুই ছিল অভিনয় ? তাও
নীলু ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারে না ।

হঠাৎ পেছন দিক থেকে একটা হল্লা শুনে ওরা ফিরে তাকালো ।
কতকগুলো অল্পবয়সী ছেলে গেরুয়াপরা একটা সাধুকে মারতে
মারতে এদিকে নিয়ে আসছে । ছেলেগুলোর অনেকের হাতে লাঠি ।
শীর্ণ দীর্ঘ চেহারার সাধুটি ঘুরে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে ওদের কিছু
বোঝাবার চেষ্টা করছে । স্পষ্টত, ওর কথা কেউ শুনছে না । গলায়
রুড্রাক্ষের মালা মাথায় জট, কাঁচাপাকা দাড়িতে সাধুটিকে দেখে
নীলুর কষ্ট হলো । না, কষ্ট হলেও তার কিছুই করার নেই ।
সে পৃথিবীর কাউকে বাঁচাতে পারে না, কেউ তাকেও বাঁচাতে পারবে
না । ছেলেদের ভেতর থেকে একজন তার কাঁধের কবল কেড়ে
নিল, একজন হাতের কমণ্ডলুটা । চিমটেটা অবশ্য কেউ নিল না ।
সাধুটি সেইটেই আকাশের দিকে তুলে অভিশাপ দিতে দিতে
চলেছে : তোরা মরবি—

শবরী সাধুর অসহায়তায় হেসে উঠলো । বললো : লোকটা
নিশ্চয়ই পাগল ।

নীলু খুব ছোটবেলায় কবে যেন মহাভারত পড়েছিল । এ রকম
একটা দৃশ্য মহাভারতের কোথায় কোন্ পর্বে যেন সে পড়েছিল, তার
আজ কিছুতেই মনে পড়ছে না ।

সাধুটাকে নিয়ে ছেলেগুলো চলে গেলে নীলু বলে : একদিন
ক্যাপ্টেন মিস্ত্রিরের ওখানে গিয়েছিলুম ।

: গিয়েছিলে নাকি ? কি দেখলে ? কিছুই নেই ?

নীলুর মুখটা খুবই করুণ দেখাচ্ছিল । তার গলাটাও হঠাৎ ভারী

হয়ে এলো। বললো : সবই আছে। শুধু ক্যাপ্টেন মিস্তিরই নেই।

: কোথায় গেছেন ?

: বছর কয়েক আগে সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে না কোথায় চলে গিয়েছিলেন। এবারেও মাস দু'তিনেক হলো কোথায় নাকি চলে গেছেন। গুঁর অফিসের একটি ছেলে বললো, এবারেও বোধ হয় উনি সেই সন্ন্যাসীই হয়ে গেছেন।

: সন্ন্যাসী ? তাহলে এই লোকটাই নয় তো ?

বলে শবরী হাসতে লাগলো।

সামনের ফুটপাতে রোদ পড়েছে গাঢ় হয়ে। তার রঙ অনেকটা শবরীর শাড়ির মতো গোলাপী। এ পাশের ফুটপাতের ছায়া ট্রাম লাইন পেরিয়ে যাচ্ছে। আর একটু পরেই গুঁড়ি মেরে ওপাশের ফুটপাত ছোবে।

শবরী ঘড়ি দেখছে ঘন ঘন। ছায়ার মতো সময়ও যাচ্ছে গড়িয়ে।

: শবরী, তোমার সাথে আমার আর একটা কথা বাকি !

: বলো—

: আমি কি তোমার জন্তে অপেক্ষা করে থাকবো ?

নীলু দেখলো, শবরী তার কথা শুনে চম্কে গেল না, শুধু একটু হাসলো। সামনের ফুটপাতের মতো তার হাসি করুণ—রহস্যময়।

: তার মানে ?

ঠিক তখনই ঘড়ি ঘড়ি শব্দ করতে করতে একটা ট্রাম হুজনের চোখের ওপর দিয়ে চলে গেল।

: ধরো, তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধা—

নীলু কথাটা শেষ করতে পারলো না। দেখতে দেখতে শবরীর ঠোঁট দুটো কঠিন হয়ে এলো। চোখ নামিয়ে ভাবলো কিছুক্ষণ।

আবার কয়েকখানা ট্রাম ভাটিতে-উজানে যান্ত্রিক শব্দ করতে করতে ভেসে চলে গেল। অনেক মানুষ, অনেক বাস, অনেক ট্যান্ডি। নীলুর কথাগুলো ওদের চাকার তলায় ভাঙতে ভাঙতে, গুঁড়িয়ে যেতে যেতে যখন একেবারে ধুলোর সঙ্গে ধুলো হয়ে গেল, তখন নীলু সরাসরি তাকালো শবরীর চোখে।

: ভাববার জন্তে দরকার হলে তুমি সময় নিতে পারো, শবরী—
শবরী এবার নীলুর মুখে তাকালো।

: তার আর দরকার হবে না, নীলিম।

শবরী কি একটু ভেবে নিল। বললো: তুমি তো কোনদিন আমাকে এ বিষয়ে কিছু বলোনি। আমিও ঠিক ওরকম কিছু ভাবিনি—

ও বিষয়ে কিছু বলার প্রয়োজন হয় কিনা, নীলু জানে না। পীযুষ তার মাসতুতো বোনের সঙ্গে যে প্রেম করলো, তাকেও কি ওরকম কিছু বলতে হয়েছিল? হয়তো হয়েছিল, সে জানে না। তবে শবরীকে সে কোনদিন কিছু বলেনি। শবরীই শুধু সুবিনয়বাবুর চেম্বারে তাকে কী যেন বলেছিল, আর কী যেন—

: আমাকে ক্ষমা করো নীলিম, আমি মৃগ্নয়কে কথা দিয়ে ফেলেছি।

কাজেই, রমলা ঠিকই বলেছিল। আর সেদিন শবরী যে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তার কারণও ছিল ঐ মৃগ্নয়। রমলা কাজেই তো সে কাল শুনেছে, সেদিন শবরীর সঙ্গে মৃগ্নয় নাকি খুব খারাপ ব্যবহার করে চলে গিয়েছিল। খারাপ ব্যবহার বলতে মৃগ্নয় কি রকম ব্যবহার করেছিল, রমলা কাল তাকে তাও বলেছে। মৃগ্নয় নাকি তাকে সন্দেহ করে। সন্দেহ করেই তাকে যা-তা বলে গাড়িতে উঠে চলে গিয়েছিল। তবু শবরী সেই মৃগ্নয়কেই কথা দিয়ে ফেলেছে!

: তবু নীলিম, তুমি মাঝে-মাঝে আম. দর বাড়ি এসো, দেখা করো।

শবরী দেখলো, নীলু অল্পাষ্ট একটু হাসলো। ধীরে ধীরে তার হাসি সামনের ফুটপাথের রোদের মতো মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

: কিন্তু শবরী, আর কি আমার তোমার বাড়ি যাওয়া কিংবা তোমার সাথে দেখা করা ঠিক হবে ?

: কেন হবে না ? বন্ধুভাবেও তো আসতে পারো ?

: তা আর হয় না, শবরী। তাতে তোমার জীবনে ছুঃখই বাড়বে।

একটু থামলো সে।

: মৃগ্ময় তোমাকে তাহলে আরো সন্দেহ করবে।

শবরীর মুখখানা ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে এলো। কপালে তার খুব স্ননিশ্চিত চিহ্নার রেখা।

: আমি লুকিয়ে তোমার সাথে দেখা করবো। তুমি কাউকে বলো না। তাহলে কেউই জানতে পারবে না।

: না শবরী, আমি ওভাবে তোমাকে চাই না।

: আমি যদি তার সমস্ত দায়িত্বটুকু নিই, তোমার তাহলে আপত্তি কিসের ?

: কি দরকার, শবরী, ওভাবে মৃগ্ময়ের সঙ্গে প্রতারণা করার ?

শবরীর টানা-টানা চোখ ছটো ভারী হয়ে ছোট হয়ে এলো। মুখ নিচু করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো সে। তারপর মুখ তুলে সে সরাসরি নীলুর মুখে তাকালো।

: কিন্তু তোমাকে যে আমি কোনদিন ভুলতে পারবো না, নীলিম ?

নীলু এবার একটু জোর করে হাসলো। বললো : তোমাকে কষ্ট করে ভুলতে হবে না, শবরী, সময়ই তোমাকে সব ভুলিয়ে দেবে।

শবরীর মুখের ওপর সঙ্কের অঙ্ককার গড়িয়ে পড়েছে। সে নির্নিমেবে নীলুর মুখের দিকে চেয়ে আছে।

ঠিক এই মুহূর্তে নীলুর মনে পড়লো, হাওড়া স্টেশনে শবরীর সঙ্গে তার প্রথম দেখা হওয়ার কথা। সেদিন আর আজ। কত তফাৎ !

শবরী কি ভেবে হঠাৎ বলে : দিল্লীর হোটেলে তুমি আর আমি ক’দিন যে একসাথে ছিলাম, ওকথা তুমি কাউকে জানতে দিও না—

নীলুর এখন মনে পড়লো, তাকে বাড়ি ফিরতে হবে। বাড়িতে তার মা পাড়ার মেয়েদের জামা সেলাই করছে বসে, তার ঘরভর্তি বুল আর মাকড়সার জাল, মিলু আজকাল তার কথা একেবারেই শোনে না, হরশংকরবাবুর কাছে এখনো তাদের কয়েক মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি...

: আমি কিন্তু, নীলিম, লুকিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করবো। তা তুমি যা-ই মনে করো—

নীলু ওর কথায় কান না দিয়ে জিজ্ঞেস করে : তোমার কোথায় যাবার কথা ছিল না, শবরী ?

: ছিল। আজ আর ওখানে যাবো না। দেরী হয়ে গেছে—

: তাহলে আমি আসি ?

: দাঁড়াও, মৃন্ময়ের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।

: মৃন্ময় এখানে আসবে ? কি দরকার আর—

: না নীলিম, তুমি দেখো, মৃন্ময় কিন্তু খুব ভালো ছেলে—

শবরী ঘড়ি দেখলো। এবার রাস্তার আলোগুলো সব একসঙ্গে অলে উঠলো। শবরী এক পাশে সরে গিয়ে ঘন ঘন এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলো। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। হঠাৎ একটা গাড়ির হর্ন শুনে শবরী চমকে উঠলো। বললো : মৃন্ময় এসে গেছে

সাদা রঙের একটা গাড়ি ফুটপাতের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো। শবরী গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল। স্তিমিয়ারিং ধরে বসে আছে একটি ছেলে। শবরী জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাকে কি বললো। তারপর হাত নেড়ে ইশারা করে সে নীলুকে ডাকে। নীলু কাছে গেল।

: নীলিম, এই হলো মৃন্ময়—

ছেলেটি দরজা খুলে দিতে একটু এল্টিক ঝুঁকে পড়েছিল। তখনই ফুটপাতের লাইটপোস্টের আলোয় নীলু ওর মুখটা স্পষ্ট

দেখতে পেলো। কোথায় যেন সে দেখেছে ছেলেটাকে। শবরী
মুন্সায়ের পাশে বসে গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিল।

এখন মনে পড়লো নীলুর। শবরীর বাড়ি থেকে প্রথম দিন
কেরার পথে বাস থেকে নেমে সেন্ট্রাল এভিনিউ দিয়ে হাঁটতে গিয়ে সে
একটা বারের সামনে একটা মাতাল ছেলেকে দেখেছিল। আজ
তাকে চিনতে একটুও কষ্ট হয়নি নীলুর।

গাড়ি স্টার্ট নিয়ে চলে যাচ্ছে। শবরী হাত নাড়ছিল। নীলুর
ইচ্ছা হলো, সে চিৎকার করে বলে : শবরী, তুমি যেয়ো না ঐ
ছেলেটার সঙ্গে। আমি ওকে চিনি। ও একটা মাতাল। মদ খেয়ে
কোনদিন ও তোমাকে—

গাড়িটা দ্রুত ওর চোখের ওপর থেকে সরে গেল।

বাড়ি ফিরে নীলু দেখলো, মিলু তখনো ফেরেনি। মিলু কখন ফেরে, কখন বেরোয়, ওর সময়ের কোন ঠিক নেই। অফিস থেকে ফিরে এসে নীলু কোনদিনই মিলুকে দেখতে পায় না। মিলু তখন ফেরে না। নীলু মুখ-হাত-পা ধুয়ে জামা-প্যান্ট বদলে একটু কিছু খাবার খেয়ে শান্তি ঘোষ স্ট্রীটের মোড়ের আড্ডায় বেরিয়ে যায়। ফেরে রাত ন'টার পর। তখন ছাখে, মিলু তার বিছানায় বই খুলে বসে পড়ছে। চারপাশে মানুষের মাথার খুলি হাড় ইত্যাদি ছড়ানো।

সেদিনের পর থেকে নীলু মিলুর সঙ্গে খুব একটা কথাবার্তা বলে না। রাতে নীলু প্রায়ই আগে আগে খেয়ে নেয়। সবাই একসাথে বসে খাওয়ার পাট চুকে গেছে।

আজ্ঞে নীলু আগে খেয়ে নিল। আলো নিবিয়ে দিয়ে শুতে গিয়ে দেখলো, মিলু তখনো ফেরেনি। কী যে হয়েছে মিলুটার আজকাল! হলোই বা মেডিক্যাল ক্লাস! এত রাত অবধি আবার কোনো ক্লাস হয় নাকি? রোববারও কি ছুটি নেই? যাক, ওসব মিলুর ব্যাপার—মিলু বুঝবে। আজকাল সে তো নীলু কথা একদম শোনেই না।

ফাঁকা ঘরে নিজেকে নীলুর আজ খুব একা মনে হচ্ছে। ঘরে মিলু নেই, মনের ভেতর শবরীও নেই, রমলাও নেই। সব ফাঁকা। নীলু মনে মনে শপথ করে নিয়েছে, সে শবরীর কথা আর ভাববে না। সে যদি জানতো, শবরী আগে থেকে গৃহময়কে কথা দিয়ে ফেলেছে, তাহলে শবরীকে নিয়ে সে এতদূর ভাবতো না। কিন্তু শবরী শেষে কিনা একটা মাতাল ছেলের সঙ্গে ঘর বাঁধবে, একথা ভাবতেই তার মনটা খারাপ হয়ে যায়। সে নিজের চোখে দেখেছে, ছেলেটা একদিন সেন্ট্রাল এভিনিউর একটা বারের সামনে মাতলামো করছিল।

শবরী বলছিল, মৃগয় ছেলেটি খুব ভালো। সে কি জানে না মৃগয় মদ খায়, মাতলামো করে? হয়তো জানে। জেনেওনেই সে হয়তো মৃগয়কে কথা দিয়েছে। যাক্, সে আর শবরীর কথা কোনদিন ভাববে না।

নীলু আজ থেকে সম্পূর্ণ একা। আজ থেকে সে আর জগতের কারো কাছে নীলিম নয়—নীলু, শুধু নীলুই। শবরী বলেছিল, সে লুকিয়ে তার সাথে দেখা করবে, মৃগয় কিছুই জানবে না। তার মানে সারাজীবন সে একই সঙ্গে মৃগয় আর নীলু—ছজনকেই প্রভারণা করে যাবে। নীলু শবরীকে খুব স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে যে, সে কারো ঘরে এভাবে সিঁধ কেটে চুরি করতে পারবে না। সে শবরীকে তার সঙ্গে দেখা করতে বারণ করেছে। সে-ও দেখা করবে না, শবরীও দেখা করবে না। সেই ভালো।

শবরী মৃগয়ের সঙ্গে সুখী হোক।

সে তার মা, বোন, ভাই, ঘরভর্তি বুল, মাকড়সার জাল, অস্বহীন অভাব নিয়ে ধুকতে ধুকতে বেঁচে থাকবে। আর থাকবে তার সেই অসুখ, সেই নীল অসুখ। তাতে সে জলবে, পুড়বে—জলতে জলতে একদিন সে শেষ হয়ে যাবে।

মার সেলাইর কলের শব্দ শুনতে শুনতে নীলু কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। মরু রাস্তিরে হঠাৎ মার ডাকে তার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুমের ভেতর সে কী শুনছিল, বুঝতে পারেনি। ঘুম-জড়ানো চোখে উঠে বসে সে জিজ্ঞেস করলো : কি বলছো, মা ?

: মিলু এখনো ফেরেনি।

নীলু মিলুর বিছানার দিকে তাকালো। ওটা খালি পড়ে আছে সে জিজ্ঞেস করলো : ও আজ কিছু বলে যায়নি ?

: না।

মার মুখে চিন্তার চিহ্ন স্পষ্ট।

: কী যে হয়েছে আজকাল ওর—

নীলু কিছুক্ষণ মুখ নিচু করে কি ভাবলো।

: ক'টা বাজে বলো তো মা ?

: ছুটো—

: সকাল হোক, তখন দেখা যাবে। তুমি এখন ঘুমোও গিয়ে, মা।
মা আলো নিভিয়ে দিয়ে চলে যেতেই নীলু আবার শুয়ে পড়লো।
এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই অসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ল।।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই নীলুর মনে ষড়লো, কাল রাতে
মিলু ফেরেনি। খুব তাড়াতাড়ি চা খেয়ে বাজারটা করে দিয়ে
সে বেরিয়ে পড়লো। প্রথমে মিলুর কলেজে গেল। গেটে পুলিশ
বসে আছে। তাকে ভেতরে ঢুকতেই দিল না। পুলিশের লোক
বললো : এখন ভেতরে কেউ নেই। দশটার সময় সব আসবে।
তখন আসুন—

তবু নীলু গেটের সামনে একটু ঘোরাঘুরি করলো, যদি মিলুর
বন্ধুদের কাউকে সে দেখতে পায়। কাউকেই দেখতে পেল না সে।
বন্ধুদের ঠিকানা তো তার জানা লেই। তাহলে একবার চেষ্টা করে
দেখা যেতো।

মুখ শুকিয়ে সে বাড়ি ফিরে এলো।

মাকে সব বললো। মা শুনে কিছু না বলে রান্নাঘরে চলে
যাচ্ছিল।

নীলু জিজ্ঞেস করলো : তুমি ওর বন্ধুদের কাবো ঠিকানা
জানো, মা ?

মা মীনার মুখের দিকে তাকালো। মীনা বললো : ও কি
কখনো কাউকে ঠিকানা দেয় ? কথাই বলে না কারো সঙ্গে—

নীলু বললো : মীনা, তুই ওর বইখাতা ঘেঁটে ছাখ্ তো,
কোথাও কোন ঠিকানা আছে কিনা কিংবা কোন চিঠি—

মা রান্নাঘরে চলে যাচ্ছিল। নীলু বলে : তুমি কিছু ভেবো না,
মা। আমি অফিস যাবার পথে আর একবার ওর কলেজ হয়ে
যাবো। তখন সবাই এসে যাবে। কে যায় আর যাবে ? হয়তো
কোন বন্ধুর বাড়ি—

সেদিন নীলু সকাল-সকাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। ওদের গলির মুখেই দেখা হয়ে গেল মিলুর বন্ধুদের সঙ্গে। ওরা ওদের বাড়ি আসছিল। ওদের চোখ-মুখ বসে গেছে, মাথার চুল অবিগুস্ত। স্পষ্টত, কাল রাতে ঘুমোয়নি।

নীলু ওদের দেখে খানিকটা স্বস্তি পেল। জিজ্ঞেস করলো : মিলু কোথায় ?

নীলু ওদেরকথাবার্তা, চালচলন পছন্দ করে না। একদিন সে মিলুর ঘরে তন্দ্রাদির সঙ্গে তাদের কথাবার্তার কিছুটা শুনেছিল। এবং তা যে তার ভালো লাগেনি, তা সে সেদিন এদের জানিয়েও দিয়েছিল। আজ মিলুর খোঁজ আগে চাই, পছন্দ-অপছন্দ পরের কথা।

: মিলুকে তোমরা ছাখোনি ?

একজন বললো : আন্সন দাদা, বলছি।

বড় রাস্তায় পড়ে ওরা নীলুকে বললো : মিলু শুধু আপনারই ভাই নয়, আমাদেরও বন্ধু। দাদা, আপনি চটে যাবেন না। মিলুকে কাল ওরা ভয় দেখিয়ে ধরে নিয়ে যায়।

নীলুর মাথার ভেতর গরম রক্ত খেলা কবছিল। সে চেষ্টা করে ওঠে : ওরা মানে কারা ?

: বলছি দাদা। সবই বলবো। কিন্তু আপনি এখন রাগ করবেন না। এখন রাগের সময় নয়। আগে সব শুনুন।

ছেলেটি একটু দম নিল।

: তারপর কাল বিকেলে কলেজের পেছনে ওকে খুঁজে পেলুম আমরা। গায়ে অসংখ্য চোট। তখনও বেঁচে ছিল। হাসপিটালে ভর্তি করে দিলুম আমরা। কিন্তু—

নীলুর পা টলে গেল। সমস্ত শরীরটা তার কাঁপছিল।

: মিলু বেঁচে নেই ?

: সাতটার একটু আগে ও মারা গেল।

: মিলু নেই ?

নীলুর সমস্ত ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে

কোনদিন কাঁদেনি। আজ সে কেঁদে ফেললো। মিলুর বন্ধুরা ওকে ধরে নানাভাবে বোঝাতে লাগলো। ওরা ওকে আর কী-ই বা বোঝাবে? এই মিলু যখন ছোট, এক বছরের বা দু বছরের—ঠিক মনে নেই, তার পিঠে চড়ে ও কতদিন ঘোড়ায় চড়া খেলেছে। মুখে কথা আটকিয়ে যেতো, আধো আধো কথায় মীনাকে বলতো : দে না দিদি চড়িয়ে আমাকে! সেই মিলু আজ নেই? সে যে আজ অফিস যাবার নাম করে মিলুকে খুঁজতে বেরিয়েছে! এখন সে মাকে গিয়ে কি করে বলবে, মিলু নেই, মিলু মারা গেছে?

মিলুর বন্ধুরা বললো : এখন মাসিমাকে খবরটা দিয়ে কাজ নেই দাদা। ডেডবডি মর্গে আছে। চলুন, ওটা নিয়ে এসে মাসিমাকে আমরা একবার দেখিয়ে নিয়ে যাবো। আর আমরা বন্ধুরা মিলে কিছু টাকা তুলেছি। ওতেই মিলুর কাজ হয়ে যাবে।

নীলুর সামনে সমস্ত পৃথিবীটা ছলছিল। সে কি করবে, ভেবে পাচ্ছিল না।

তাই হোক! সে মিলুকে একবার বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। মা তার ছোট ছেলের পথ চেয়ে থাকবে। মাকে সে একবার দেখিয়ে নিয়ে যাবে মিলুকে। সেই শেষদেখা। মীনা তার ছোটভাইকে একবার শেষদেখা দেখবে না?

কিছুদূর এগিয়ে নীলুর মনে পড়লো পীযুষ, চন্দন আর মাল্টুর কথা। বিপদে-আপদে চিরদিন ওরা সঙ্গে আছে। ও পীযুষদের বাড়ির সামনে পৌঁছেতেই পীযুষ নেমে এলো। সে অফিসে যাবার জন্তে তৈরি হচ্ছিল। সব শুনে জামা প্যাণ্ট বদলে বেরিয়ে এলো। শাস্তি ঘোষ স্ট্রিটের মোড়ে চন্দন আর মাল্টুর দেখা পাওয়া গেল। ওরাও সঙ্গে চললো।

বেলা একটার সময় ওরা মিলুকে খাটে শুইয়ে বাড়ি নিয়ে এলো। ইতিমধ্যে মার কানে কথাটা কি করে পৌঁছেছিল। রাস্তায় নীলুকে কাঁদতে দেখেছিল কেউ সে চুপি চুপি মীনাকে খবরটা দিয়ে গেছে।

দরজার সামনে খাট নামানো মাত্র মা আর মীনা দরজা খুলে বেরিয়ে এসে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। মিলুকে বৃকে চেপে মার সেই দুঃসহ কান্নায় নীলুর বৃকের ভেতরটা ধসে ধসে পড়ছিল। মা কাল রাত থেকে খায়নি। মিলুর পথ চেয়ে বসে আছে।

: মা, তোমার মিলুকে এনে দিয়েছি। বলো, এখন আমরা কি করতে হবে? তুমি যাই বলবে, তাই করবো মা। আই ডোর্ট কেয়ার ফর—

মা অজ্ঞান হয়ে গেছে। তার চোখে আর জল নেই। ওপরের জেঠিমা, তাঁর মেয়েরা, পাড়ার মেয়েরা—যারা মাকে ভালোবাসে, তারা এসে ভিড় করে দাঁড়িয়ে দেখছিল মিলুকে। তারা ধরাধরি করে মাকে ভেতরে নিয়ে গেল।

মিলুর বন্ধুদের একজন ছুটে গিয়ে বাজার থেকে কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা মালা কিনে নিয়ে এলো। ওরা বললো : মাসিমা মিলুকে এই মালাটা পরিয়ে দিলেই আমরা মিলুকে নিয়ে চলে যাবো। দাদা, একবার মাসিমাকে নিয়ে আসুন।

এ যে কঠিন দায়িত্ব! নীলু ভেতরে গেল। মা তার বিছানায় চোখ বুজে শুয়ে ছিল। জ্ঞান ফিরেছে। পাড়ার একটি মেয়ে মার মাথার কাছে বসে হাওয়া করছে। অগ্ন্যাগ্নরা জল দিচ্ছে চোখে-মুখে-মাথায়।

: মা, মিলুকে একটা মালা দেবে চলো—

: ও আমাদের ছেড়ে চলে গেল। ওকে আমি আর কিছু দেবো না।

মা বালিশে মুখ চেপে কাঁদতে লাগলো। দরজার কাছে পাড়ার নন্দদী দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন : কেঁদে আর কি হবে, বলুন? আজকাল হামেশাই এসব হচ্ছে। ভয় তো এ ব্যবসায়ের ছেলোদের নিয়ে। কাগজে দেখেন না? আমাদের হীরের টুকরো ছেলেরা সব এইভাবে চলে যাচ্ছে—

নীলুর মনে পড়লো, যেদিন মিলুর স্কলারশিপ পাবার খবর

এসেছিল, সেদিন নন্দদা মাকে কত আমার কথাই না শুনিয়ে গিয়েছিলেন ! আজ নন্দদার গলায় সেদিনের সুর নেই। আজ নন্দদার মুখটা ধম্ধম্ করছে।

অনেক সাধাসাধির পর মা উঠলো। নীলু মাকে ধরলো। মীনা মার পেছনে পেছনে এলো। মিলুর বন্ধুটি মার হাতে মালাটা দিতে গেল। মা মালাটা ছুলোও না। মার চোখে নিঃশব্দে জল ঝরছিল। সে ধীরে ধীরে মিলুর পাশে গিয়ে মাটিতে বসে পড়লো। গায়ে একবার খুব আদর করে হাত বুলিয়ে দিল। যেন মিলুর অশুখ করেছে। যেন মা একবার তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে সে ভালো হয়ে উঠবে। তারপর মিলুব ঠোঁটে চুমু খেয়েই কান্নায় ভেঙে পড়লো।

মাকে পাড়ার মেয়েরা ধরাধরি করে প্রায় জোর করেই ভেতরে নিয়ে গেলে মীনা মিলুব কপালে চুমু খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললো : মিলু, আজ তুই আমার গান শুনবি না ?

নীলুব চোখে জল নেই। সে মীনাকে সবিয়ে নিয়ে গেল।

মা এবং মীনার কান্নায় ভেতর দিয়ে মিলুর ডেডবডি গলির মোড় পেরিয়ে চলে গেল।

শ্মশানে পৌঁছোতে বিকেল হয়ে গেল। পাড়ার হরশংকরবাবু, নন্দদা সবাই এসেছেন। মিলুর বন্ধুরা এসেছে। পীযুষ, চন্দন, মান্টুও এসেছে।

চিতা জ্বলছিল। আগুনের ভেতর মিলুর দেহটা হারিয়ে যাচ্ছে। নন্দদার কথাটা নীলুর বারে বারে মনে পড়ছিল : আমাদের হীরের টুকরো ছেলেরা সব এইভাবে চলে যাচ্ছে।

ঠিকই বলেছেন নন্দদা। আমাদের ভালো ছেলেগুলো সব চলে যাচ্ছে। মিলুর ওপরেই বাবা সব চেয়ে বেশি আশা-ভরসা রাখতো। মা এবং নীলুও ভেবেছিল, মিলু পাস করে বেরোলেই

তাদের সংসারের ভোল পাল্টে যাবে। না, তা আর হলো না।
তার আগেই মিলু চলে গেল।

আগুনের দিকে চেয়ে নীলু মনে মনে বললো : মিলু জেনে যা—
আমি তোকে ক্ষমা করেছি। তুই আমাকে সেদিন রাত্রে যা
বলেছিলি, আমি মনে রাখিনি, সব ভুলে গেছি—

পীযুষ নীলুর পাশে বসে ছিল। সে বারে বারে নীলুর মুখের
দিকে তাকাচ্ছিল। নীলুর দৃষ্টি ছিল না কোনদিকে। সে শুধু সামনের
আগুনের দিকে চেয়ে আছে। মিলুর দেহটা কেমন ধীরে ধীরে
আগুনের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে, সে তাই দেখছে।

মিলুর বন্ধুরা বাইরে গিয়েছিল। ফিরে এলো। নন্দদা, হরশংকর-
বাবু এবং পাড়ার অশ্বাশুরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলেন।
ওদের গলা শোনা যাচ্ছিল। চন্দন আর মাণ্টু কাছেই দাঁড়িয়ে
আছে। ওদের মুখে আজ আর কথা নেই। পীযুষ নীলুর পাশে
সব সময়ই আছে।

নীলুর মুখের ওপর চিতার আগুনের ছায়া ছলছিল।

হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে ওঠে। চিৎকার করে ডাকে : মিলু—

পীযুষ ওকে জড়িয়ে ধরলো।

: ছেড়ে দে, পীযুষ। আমাকে জানতে হবে, কেন ওরা মিলুকে
ধুন করেছে!

: সে পরে হবে, নীলু। এখন তুই চুপ কর।

পীযুষ ওকে বোঝাবার চেষ্টা করে।

: আমাকে বাজে বোঝাতে আসিস্ না তুই। কি অপরাধ
আমরা করেছি, যার জন্তে—

চন্দন আর মাণ্টু ছুটে এসে নীলুকে ধরলো : কি হচ্ছে এখানে
নীলু? চুপ কর—

: কেন চুপ করবো? এই পীযুষ, তুই পরীক্ষার হলে আমার
খাতা থেকে টুকিস্‌নি? তুই ভালো রেজাল্ট করে ভালো চাকরি
পেয়ে গেলি, আর আমি ফেল করতে করতে পাস করে—

করছি কিনা একটা—, আগুন ছুঁয়ে বল, তুই আমার খাতা
টুকিসনি ?

পীযুষ নীলুকে জড়িয়ে ধরেছে। বললো : তোমার সব কথা সত্যি।
তুই এখন চূপ কর নীলু।

মিলুর বন্ধুরাও ওকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। এবার নীলু ওদের দিকে
তাকালো। তার চোখে আগুনের ছায়া পড়েছে। চোখতুটো
আগুনের মতো লাল।

: তোমরা জানো, কারা মিলুকে খুন করেছে ?

ওরা অবাক হয়ে নীলুর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

: কথা বলছো না কেন ?

হঠাৎ নীলু আগুনের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দেয় : এই আগুন ছুঁয়ে
আমি শপথ করছি—

পীযুষ, মাগ্টু আর চন্দন নীলুকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে
গেল। শ্মশানের সামনে দাঁড়িয়ে নীলু কলকাতার ইট-কাঠ-পাথরের
রুক্ষ চেহারাটার দিকে চেয়ে রইলো। বুকের ভেতর থেকে কলকাতার
মাথার আকাশ পর্যন্ত একেবারে ফাঁকা—সেখানে জ্বলছে মিলুর
চিতার মতো আগুন—একটা ভয়ঙ্কর লাল আগুন—